নরনারী কথা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

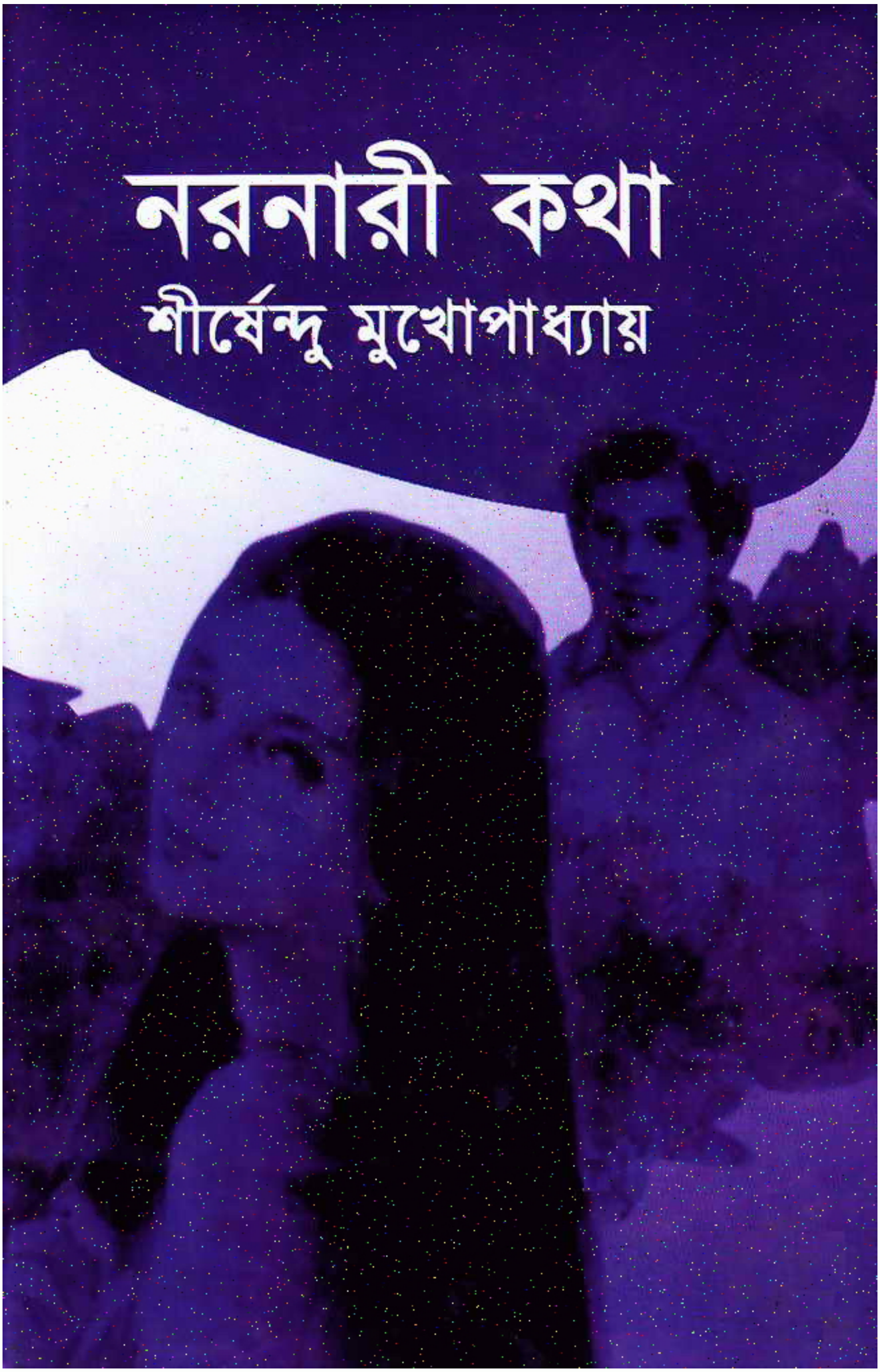

সকালের দিকটায় এ বাড়ির উঠোনে লোকজন দেখা যায় মেলা। খুড়িমারা কাঁথাকানি রোদে দেয়। জ্যাঠাইমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কাজের লোকদের বকাঝকা করেন, ইন্তি বিন্তিরা ছোটাছুটি করে, গঙ্গা যমুনা খেলে। জ্যাঠা মোড়া পেতে বসে ধান চালের হিসেব করে। পরাণদার বউ আসার পর থেকে একটু সুনসান যাচ্ছে দু দিন হল।

লোকে বলে, বউ। পরাণদা বলে, দূর, দূর! বাউলের আবার বউ কিসের? ও হল আমার সাধনসঙ্গিনী।

বলতে নেই, পরাণদার আজকাল বেশ নাম হয়েছে। নানা জায়গা থেকে ডাক পায়। মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোব্বা, কাঁধে ঝোলা আর দাড়ি গোঁফে সেই পরাণদাকে আর চেনার জো নেই। দু-চার দিনের জন্য বাড়িতে আসে বটে তারপর চরায় বরায় চলে যায়। জ্যাঠা দুঃখ করে জ্যাঠাইমাকে বলে, ওকে খরচের খাতায় ধরে রাখো।

কিন্তু রতন জানে, এ বাড়ির অন্য সব ছেলের চেয়ে পরাণদা ঢের বেশি এগিয়ে গেছে। গোটা পরগনা এক ডাকে চেনে। গানটা গায়ও ভাল। নিজেই লেখে, সুর দেয়। পয়সাও আসছে শোনা যায়। তবে কিনা আর পাঁচ জনের মতো গেরস্থ নয়। বাউল কেমন তা জানে না রতন। পরাণদাকে দেখে মনে হয়, অনেকটা সাধু সন্নিসির মতোই। বরাবরই একটু উড়ু উড়ু ভাব ছিল। ধ্যান জ্ঞান ছিল গান। তারপর গুরু ধরে একেবারে বাউল হয়ে ঘর ছাড়ল। জ্যাঠার শিরে যেন বজ্রাঘাত। দু'দিন মাথায় হাত চেপে বসে রইল নিঝুম হয়ে। জ্যাঠাইমার সে কী মড়াকান্না। তারপরে লোকে বোঝাল, বাউল মানে তো আর নিমাই সন্ন্যাস নয়। আজকাল বাউল ঘড়ি পরে, সিগারেট টানে, বিয়ে বসে, ছেলেপুলেও হয়।

তবু ধাতস্থ হতে একটু সময় লেগেছিল জ্যাঠা আর জ্যেঠির। মুখে হাসি ফুটল যখন পরাণদা একদিন এসে জ্যাঠার হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিল। এ লাইনে যে টাকাকড়িও আছে তার তেমন আন্দাজ ছিল না জ্যাঠার। মুকুন্দ পোদ এসে বলল, তুমি সত্যযুগে পড়ে আছ হে গয়ারাম। বাউলদের আজকাল টাকার লেখাজোখা নেই। এরোপ্লেনে চেপে বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসছে। এ ছেলে একদিন তোমাকে সোনার থালায় ভাত খাওয়াবে।

তাই হবে হয়তো। ইদানীং পরাণদার ঠাট একটু বেড়েছে বৈকি। বাঁ হাতে একখানা যা ঘড়ি পরে দেখলে তাজ্জব হতে হয়। ঘড়ির মধ্যে যেন

আরও দু'তিনটে ঘড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। জব্বর সব টেপ রেকর্ডারও আছে পরাণদার। তিন চারটে তো হবেই। ঝোলা থেকে মাঝে মাঝে ক্যালকুলেটরের মতো একখানা জিনিস বের করে তাতে কবে কোথায় প্রোগ্রাম আছে তা দেখে। আজকাল কিছু চামচাও জুটেছে পরাণদার। তারা সর্বদা পিছু পিছু ঘোরে।

এই দু'দিন আগে দুপুরের দিকে যখন আস্ত এক মেমসাহেবকে নিয়ে এসে হাজির হল তখন গোটা বাড়িটা যেন চমকে গেল। কী কাণ্ড রে বাবা! ঠিক বটে মেমটার পোশাক আশাক তেমন বাহারি নয়, গায়ের গাউনটাও কেমন যেন উলোঝুলো, পায়ে একজোড়া ধূলিধূসর চপ্পল আর কাঁধে বড় একটা চামড়ার ব্যাগ, তাহলেও মেম বলে কথা। ভুলু কুকুরটার সাত চড়ে রা নেই, সে অবধি মেম দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। দুই খুড়িমা ঘোমটা টেনে পালানোর পথ পায় না। জ্যাঠার মুখ হাঁ হয়ে আটকে রইল অনেকক্ষণ। জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকে দোর দিয়ে ফেলল।

পরাণদার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। মেমকে পাশে নিয়ে দাওয়াতে বসে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে হাঁক দিল, কোথায় গো সব! দেখ কাকে নিয়ে এসেছি! খোদ অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে। লজ্জার কিছু নেই গো, এ আমার সাধনসঙ্গিনী।

বাড়ির লোক ভয়ে বেরোচ্ছিল না, কিন্তু পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল এসে উঠোনে।

অত লোক দেখেও মেমসাহেব মোটেই ঘাবড়ায়নি। ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের বোতল বের করে জল খেল, গামছা বের করে মুখ মুছল। পরাণদার সঙ্গে বসে দিব্যি সবার সামনে গল্প করতে লাগল। ভাঙা ভাঙা বাংলা আর ইংরিজি মিশিয়ে। পরাণদা ইংরিজি কবে শিখল কে জানে, দিব্যি কথা কয়ে যেতে লাগল।

নিজেদের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছিল রতন। তার দিকে চোখ পড়ায় পরাণদা হাতছানি দিয়ে ডাকল, এদিকে আয়।

রাজ্যের লজ্জা চেপে ধরেছিল তাকে। তবু এগিয়ে গিয়েছিল রতন।

পরাণদা মেমসাহেবের দিকে চেয়ে বলল, মাই কাজিন। রতন।

মেমসাহেব তাকে দেখে হলদেটে দাঁতে একটু হেসে বলল, হাই রটন। তারপর পরাণদার দিকে চেয়ে বলল, হি ইজ কোয়াইট টল।

পরাণদা হেসে বলল, হ্যাঁ, খুব ঢ্যাঙা। ও রতন, বুঝলি কী বলল?

না বোঝার কিছু নেই। রতন তো বারো ক্লাস পাশ করেছিল, নাকি?

মেমসাহেবদের বোধহয় প্রণাম করতে নেই। কিংবা কে জানে বাবা, আছে কিনা। তবে পরাণদার বউ বলে ধরলে এ তার বউদি হয়। প্রণামটা পাওনাই।

পরাণদা বলল, দু'দিন জিরোব। একে একটু গাঁ ঘুরিয়ে দেখাস তো।

গাঁ গঞ্জ খুব ভালবাসে।

রতন ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

বাড়ির লোকের আড় ভাঙতে একটু সময় লাগল। বাড়ির সবচেয়ে ডাকাবুকো মেয়ে হল গীতালিদিদি। মুঠো করে আরশোলা ধরে, গাছে উঠে সজনে পাড়ে, একবার জানালা দিয়ে একটা চোরের হাত চেপে ধরেছিল। গীতালিদিদিই বুদ্ধি করে একটা ডাব কেটে নিয়ে এল। মেমসাহেব ভারী খুশি হল ডাব দেখে। ডাব থেকে ভাব হতেও সময় লাগেনি। তারপর একে একে লজ্জা-লজ্জা ভাব করে খুড়িমারা এগোল। তারপর কাকা জ্যাঠাও। বৃত্তান্ত কী, কোথা থেকে মেম এল, নানা কৌতূহল।

পরাণদা কেবল হা-হা করে হাসে আর বলে, দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে গো। সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আরে, এও তো একটা মেয়েই। গায়ের রংটা আলাদা এই যা।

বউ বরণ করা হবে কিনা তা জ্যাঠাইমাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল বড় খুড়ি। জ্যাঠাইমা তেড়ে উঠে বলল, মরণ! ওই খেরেস্তানের মেয়ে আবার বউ কি লা? বরণের গলায় দড়ি।

বউ কিনা তা শেষ অবধি সাব্যস্ত হল না। পরাণদা বলছে বউ নয়। অন্যেরা বলছে বউই। না হয় রাখা মেয়েছেলে। আর এ নিয়ে সারা বাড়িতে গুজগুজ ফুসফুস হাসাহাসি ঠেলাঠেলি। জ্যাঠাইমার আষাঢ়ের মতো মুখ। আর জ্যাঠার ফের মাথায় হাত।

পরাণদাদা যে উচ্চমার্গে উঠেছে তাতে রতনের সন্দেহ নেই। এই যে মেমসাহেবকে নিয়ে চারদিকে এত ঠাট্টা মস্করা, এই যে তার মা বাবার মুখ ভার এতেও পরাণদা নির্বিকার। ব্যাপারটা নিন্দনীয় বা দৃষ্টিকটু হল কিনা, পরিবারের মাথা কাটা গেল কিনা, বংশের মুখ কালো হল কিনা এ নিয়ে তার মোটে কোনও মাথাব্যথাই নেই। সর্বদা ভাবের জগতে বিচরণ, আহ্লাদে ডগোমগো হয়ে আছে।

রাতে এক ঘরে শুল দু'জনে। জ্যাঠাইমা একটু আপত্তি তুলেছিল বটে, পরাণদা বলল, বলেই তো দিয়েছি এ আমার সাধনসঙ্গিনী। নানা প্রক্রিয়া আছে। সাধনসঙ্গিনী ছাড়া ওসব হয় না। আমি কি তোমাদের মতো গেরস্ত? বাউলের জীবনধারাই আলাদা।

জ্যাঠাইমা আর কথা বাড়ায়নি। তোম্বা মুখে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দোর দিয়েছিল।

এসব পরশুর ঘটনা। কাল সকালে মেমসাহেব তাকে নিয়ে বেরোল। একটু ভয় ভয় করছিল রতনের। ইংরিজি বলতে পারবে কি সে? গাঁয়ের স্কুলে তো ভাল ইংরিজি শেখায় না।

ভয় ভাঙতে অবশ্য দেরি হল না। দেখা গেল, মেমসাহেব একটু একটু বাংলা বলতে পারে। সে একটু একটু ইংরিজি বলতে পারে।

মিলিয়ে মিশিয়ে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না তো! প্রথমটায় একটু আটকাচ্ছিল, ট্রানস্লেশন করে করে বলতে হচ্ছিল তো? পরে দেখল, ভুলভাল বললে মেমসাহেব কিছু মনে করছে না।

ঝোঁক এসে গেলে ভাষার বেড়া টপকানো সহজ হয়ে যায়।

কল মি মারিয়া।

নাম ধরে কি ডাকা যায়! শত হলেও তো বউদি। কিছুক্ষণ বাদে তাও ডেকে ফেলল সে। নদীর ধারে খেয়াঘাটের বটতলায় এসে মারিয়া এত মুগ্ধ যে বাক্য হরে গেল। পাথরের ওপর বসে তাকেও হাত ধরে টেনে নিজের কাছ ঘেঁষে বসাল।

ইউ আর টল। হাউ টল আর ইউ?

মাপিনি তো! নেভার মেজারড।

মাস্ট বি সিক্স ফিট ওয়ান।

এই গাঁ দেশে তার মতো ঢ্যাঙা ছেলে একটা রসিকতার বস্তু। ইস্কুলে তাকে সবাই বলত লম্বু। নিজের এই লম্বা শরীরের জন্য লজ্জাই করত রতনের। মেমসাহেবের সেটাই ভাল লেগেছে দেখে সে বেজায় খুশি।

হাউ ওল্ড আর ইউ?

টুয়েন্টি থ্রি।

আই অ্যাম টুয়েন্টি সেভেন।

মারিয়াকে অবিশ্যি আরও একটু কম মনে হয়।

একটু থেমে থেমে বলল, তুমি কী করো?

একটু ভেবে নিল রতন। তারপরে বলল, কিছু করি না।

ইউ আর কালটিভেটরস, আর নট ইউ?

এ কথাটার মানে জানে না রতন। আমতা আমতা করছিল।

চাষ করো?

রতন এবার বুঝল। মাথা নেড়ে বলল, আমি করি না। লোক আছে।

নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে রইল তারা। খুব বেশি কথা হয়নি। কিন্তু ভাব হল বেশ। কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে কালীমূর্তি দেখাল তাকে রতন। মারিয়া অবশ্য কালীমূর্তি অনেক দেখেছে। কোথাকার কালী কেমন, শ্মশানকালী আর রক্ষাকালীর তফাত কী সব জানে।

তুমিও কি বাউল মারিয়া?

ইয়েস, আই অ্যাম এ বাউল। আই হ্যাভ মাই গুরু।

বাউলতত্ত্বও খানিক বোঝাল মারিয়া। রতন কিছু বোঝেনি। কিন্তু কথাগুলো হাঁ করে শুনেছিল। কত দূরের দেশ থেকে এসে মাঠেঘাটে ঘুরছে, যেখানে সেখানে পড়ে থাকছে, ব্যাপারটাই তাদের জীবনের সঙ্গে মেলে না।

সারাদিন আর দেখা হয়নি কাল। বাড়ি আসতেই মহিলারা সব ঘিরে ফেলল মেমসাহেবকে। একটা আজব খেলনা পেয়েছে তারা। বদ্ধ

জীবনের পুকুরে ঢিল পড়েছে, ঢেউ ভাঙছে।

অনেক রাত অবধি ঘুম আসেনি রতনের। অধিক রাতে তার মাতাল বাবা ফিরল গালাগাল করতে করতে। অশ্রাব্য গালাগাল। রতনের মা পালিয়ে গেছে সেই চৌদ্দ বছর আগে। এই চৌদ্দ বছর ধরে মাকে নাগাড়ে গালাগাল করে যাচ্ছে বাবা। একদিনও বাদ যায় না।

তখন তার বয়স নয়। দিদির এগারো। গাঁয়ে যাত্রার দল এসেছিল একটা। সাত দিন ধরে শো। ভিড়ে ভিড়াক্কার। দুটো পালা দেখেওছিল সে। তার মধ্যে একটা সুন্দরপানা ছোকরা বিল্বমঙ্গলের পার্ট করত। তার গানের গলাও ছিল ভারী ভাল। মনোজকুমার। তা সেই মনোজকুমার আর আরও কয়েকজন তাদের বাড়িতে খেতে আসত। ওটাই রেওয়াজ ছিল। যাত্রাপার্টির লোকেরা ভাগ ভাগ হয়ে গাঁয়ের একেক বাড়িতে খাবে। মনোজকুমার খেতে বসত, মা পরিবেশন করত। ছোট জ্যাঠাইমা বলে, তখনই দেখতুম তোর মাকে ছোঁড়াটা কী সব যেন বলে, আর তোর মা খুব হাসে। ছুঁড়ির তো আগুনের মতো রূপ ছিল রে।

এসব কথা যে শুনতে ভাল লাগে রতনের তা নয়। আবার না শুনেও পারে না। চৌদ্দ বছর ধরে সে ভাবছে, তার মা দুটি সন্তানকে ফেলে কেন উটকো একটা লোকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। অথচ তাকে আর দিদিকে মা কী ভীষণ ভালবাসত। কী করে পারল মা? ভাবে, রোজ ভাবে রতন। কিন্তু প্রশ্নটার জবাব পায় না।

মদ তার বাবা একটু আধটু আগেও খেত। মাতাল হওয়ার জন্য নয়। তার বাবাই তখন ছিল সংসারের কর্ণধার। চাষবাস দেখা, দোকানপাট, কারবার সামলানো। ভারী করিৎকর্মা লোক, খুব দাপটের লোক। বাবার আমলে ব্যবসা বাণিজ্য, চাষবাস ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। জ্যাঠা কাকারা সবাই বাবার উপরেই নির্ভর করে থাকত। কাউকে মাথা ঘামাতে হত না। তবে এই করতে গিয়ে উদয়াস্ত ভারী ব্যস্ত থাকত বাবা, ঘরে থাকার সময়ই পেত না। দু'চার দিন কাজেকর্মে বাইরেও থাকতে হত। হ্যাঁ, তখন বাবা অত খাটাখাটনির জন্যই একটু আধটু মদ খেত বটে কিন্তু মাত্রা রেখে। মা পালিয়ে যাওয়ার পর একেবারে বেহেড হয়ে গেল। আর এই খারাপ খারাপ কথা যে তার বাবা জানে তাও তারা বুঝতে পারেনি কোনও দিন। ভারী ভদ্র সভ্য মানুষই তো ছিল বাবা! একটু রাশভারী আর একটু রাগী, এই যা।

কাল রাতেও গালাগাল করতে করতে ফিরল, ঢ্যামনা মাগি, বেশ্যা মাগি। তুই বেশ্যা, তোর মা বেশ্যা, তোর বাবা বেশ্যা, তোর চৌদ্দ পুরুষ বেশ্যা। এত চুলকানি তোর! অ্যাঁ! এত চুলকানি! লোহা গরম করে ঢুকিয়ে দিতে হয়... ইত্যাদি। আগে ভাই বোন কান চেপে শুয়ে থাকত দাঁতে দাঁত দিয়ে। আজকাল সয়ে গেছে।

রোজ সকালে খোয়াড়ি ভাঙার পর তার বাবা তাদের দেখলেই ভারী

অবাক হয়ে বলত, এখনও মরিসনি তোরা! এখনও মরিসনি! বেঁচে থেকে কী করবি! পাপ গর্ভে জন্ম। বড় হয়ে একটা বেশ্যাগিরি করে খাবি, আর একটা গিয়ে মাগিবাড়ি পড়ে থাকবি। মর! মর! মরে যা।

তখন তারা তো খুব ছোট নয়। সব বোঝে। খারাপ খারাপ কথা শুনে দিদি হাউমাউ করে কাঁদত, সে ভয়ে ঘেন্নায় আত্মগ্লানিতে এতটুকু হয়ে থাকত।

জ্যাঠা মাঝে মাঝে বাবাকে বলত, ওরে অভিরাম, ওসব কী কথা? ছেলেপুলেরা বড় হচ্ছে, কী শিক্ষা দিচ্ছিস! ছিঃ ছিঃ! এসব কথা উচ্চারণ করতে আছে?

জ্যাঠাইমাও বলত, ওদের খোঁড়ো কেন ঠাকুরপো? ওদের কী দোষ? বাচ্চাদুটো একেই ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হয়ে থাকে, সবসময়ে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কী লাভ? তোমার যেমন বউ গেছে, ওদেরও তো মা গেছে!

আহত পৌরুষ তার জ্বালা ভুলতে পারে না আজও। চৌদ্দ বছর ধরে জ্বালা জুড়োলো না। বয়স ছিল, আর একটা বিয়েও তো করতে পারত বাবা! কেন করল না কে জানে। প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু। বাবা শুনলেই খেপে উঠত, মেয়েমানুষ! শালা আবার ওই খানকিদের পাল্লায় পড়ব? যাও যাও!

প্রস্তাব পালিয়ে যেত।

থানা-পুলিশ হয়েছিল। যাত্রার দল তখন ভিনগাঁয়ে চলে গেছে। দলের ম্যানেজারকে ধরেওছিল পুলিশ। কিন্তু লাভ হয়নি। মনোজকুমার দল ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে কেউ জানে না। বাবা একজন গুণ্ডাকেও লাগিয়ে ছিল ওদের লাশ নামাতে। কিন্তু মনোজকুমার এবং সাবিত্রীর কোনও হদিশই করতে পারেনি কেউ। খোঁজ পেলে তাদের মা যে খুন হয়ে যাবে তা বুঝতে পেরে তারা দুই ভাইবোন গোপনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করত, হে ভগবান, মাকে যেন ওরা খুঁজে না পায়।

কাল রাতে অনেকক্ষণ জেগে ছিল রতন। শুয়ে শুয়ে পাশের ঘরে বাবার কাতরানি শুনল। লোকটার এখন পেটে শূল ব্যথা হয়। ডাক্তার দেখে বলেছে, মদ বন্ধ করতে হবে। বাবা এসব গায়েই মাখে না। কাল রাতে বিছানায় পড়ে খুব গোঙাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছিল। সব শেষ করলি খানকি মাগি? সব শেষ করলি? খেয়ে নে মাগি, সব খা। ছেলে মেয়ের মাথা খা, পিণ্ডি খা, খা.... নরক, নরক।

কখনও কখনও লোকটার জন্য একটু মায়া যে না হয় তার তা নয়। হয়। কিন্তু বাবার সঙ্গে তার তফাত ঘটে গেছে দুস্তর। এই ফাঁক আর ভরাট হওয়ার নয়। কথাবার্তা খুবই কম হয় তার সঙ্গে। খুব প্রয়োজনে এক আধটা কথা। তার বেশি নয়। বছর পাঁচেক আগে দিদির বিয়ে হয়ে বেঁচেছে। সেও একদিন পালাবে।

এজমালি হলেও তাদের সম্পত্তি বিরাট। জমিজমা তো আছেই। তা ছাড়া আছে চারটে চালু ব্যবসা। দড়ি আর তামাক পাতার দুটো পাইকারি কারবার, একটা বড় মুদিখানা, একটা সার আর কীটনাশকের দোকান। সব ব্যবসা আর চাষবাস আগে বাবা একাই দেখত। এখন জ্যাঠা কাকারা দেখে। তার বাবা সবই প্রায় ছেড়েছুড়ে দিয়েছে। দিনমানে শুধু সারের দোকানটায় গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। বসে থাকলেও মাসকাবারে আয়ের মোটা ভাগ পায়। এখনও এ বাড়ির হেঁসেল ভাগ হয়নি। এ বাড়ি ছাড়লে রতনের অনেক ক্ষতি, সে জানে। তবু এ বাড়িতে আর তার থাকতে ইচ্ছে যায় না। ওই জঘন্য লোকটার সংস্পর্শ ত্যাগ না করলে সে বাঁচবে না।

কাল রাতে ঘুম আর আসতেই চায় না। অঘ্রানের প্রথম শীত-শীত আমেজে পাতলা কাঁথায় গা-ঢাকা দিয়ে শুলে আরামে ঘুম চলে আসার কথা। এল না মারিয়ার জন্যই। কী আশ্চর্য মেয়ে! দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সংকোচহীন। খেয়াঘাটে গা ঘেঁষে বসেছিল, সেই স্পর্শটা বারবার মনে পড়ছিল তার। না তার মনে কোনও পাপ নেই। শত হলেও সম্পর্কে বউদি। কিন্তু মারিয়া তার কাছে যেন একটা ভিন্ন জগতের খবর নিয়ে এসেছে। শুয়ে শুয়ে মারিয়ার কথা অনেকক্ষণ ভাবল সে। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ সকালেও মারিয়ার তার সঙ্গে বেরোনোর কথা। তাই আড়ে আড়ে ওপাশের ঘরের দিকে চাইছিল রতন। দরজা ভেজানো। হয়তো একটু বেলায় উঠবে। মোটে তো পৌনে আটটা বাজে। ভিতরটা একটু অস্থির হচ্ছে তার। একটা পিপাসার মতো ভাব।

উঠোনে আজ কাঁথাকানি রোদে দেওয়া হয়নি। দড়িতে ভেজা কাপড় মেলেনি কেউ। চেঁচামেচি নেই। মেমসাহেবের সম্মানে গোটা বাড়িটাই সভ্যভব্য হওয়ার একটা চেষ্টা করছে।

দরজা খুলে পরাণদাই প্রথম বেরোলো। পরনে লুঙ্গি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, ঝুঁটিখোলা এলো চুল মেয়েমানুষের মতো পিঠ বেয়ে নেমেছে।

সীতা বোষ্টমী ভিক্ষে করতে এসে পরাণদাকে দেখে জিব কেটে বলল, ও দাদা গো! তুমি এয়েছ? আজ কার মুখ দেখে উঠেছি গো! তা নতুন কী গান বাঁধলে?

পরাণদার তেমনি হা হা হাসি, গান তো বেঁধেই চলেছি রে! গানের কি শেষ আছে? তুই গা দেখি একখানা, শুনি!

ফের জিব কেটে বষ্টুমি বলে, ওরে বাবা! তোমার সামনে গাইব কী গো! জিব টেনে ধরবে যে!

আহা, সারা দিন তো গেয়েই বেড়াস, অত লজ্জা কিসের? গা দিখি একখানা জুত করে। এই নে দশটা টাকা রাখ।

বলে দশটাকার একখানা নোট লুঙ্গির কষি থেকে বের করে ছুড়ে

দিল পরাণদাদা।

সীতা বষ্টুমি বগ্‌বগ্‌ খুশি। টাকাটা কপালে ঠেকিয়ে ঝোলায় রেখে চড়া গলার গান ধরে ফেলল। নিমাই সন্ন্যাস পালার গান। বিস্তর শুনেছে রতন। বষ্টুমির স্টকে বেশি নেই। দু'চার খানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়। সে তো আর শিল্পী নয়। ক্ষুর্ধাত মানুষ। শিল্প ভাঙিয়েই খায়। তার শিল্প খিদের মাপে মাপে।

পোশাক পরে একেবারে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল রতন। যাতে মারিয়ার নজরে পড়ে।

ওরে রতন!

হ্যাঁ পরাণদা।

আজ মারিয়াকে চাষবাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আয়।

চাষবাড়ি! সে তো অনেকটা পথ।

কত আর! মাইল পাঁচেকের বেশি তো নয়। সাইকেলের রডে চাপিয়ে নিয়ে যা।

সাইকেলে! সে কি বউদি পারবে?

খুব পারবে। ওর সবরকম অভ্যাস আছে।

তার চেয়ে নয়নদার মোটরবাইকটা বরং চেয়ে আনি।

কিন্তু নয়নের মোটরবাইক পাওয়া গেল না। একজস্ট পাইপ ফেটে গেছে।

ফিরে এসে দেখল, হলুদ রঙের একখানা গাউন পরে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! মিষ্টি হেসে বলল, হাই রটন।

রতনের বুকটা যেন চলকে গেল।

দুই

অগত্যা সাইকেল।

কর্ণের যেমন কবচ কুণ্ডল রতনের তেমনি সাইকেল। এ যেন তার শরীরেরই একটা বাড়তি অংশ।

হালকা চেহারার মারিয়া অনায়াসে রডে চেপে বলল।

রতন বলল, রোড ইজ ব্যাড। জার্কিং।

মারিয়া ভারী সুন্দর হেসে বলল, আই নো। ও কে উইথ মি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই অস্বস্তিতে পড়ে গেল রতন। রাস্তায় পাশের পাল বাড়ির ভুবনজ্যাঠা দাঁড়িয়ে একটা কামলার সঙ্গে কথা কইছিলেন। কথা থামিয়ে এমন হাঁ করে চেয়ে রইলেন যে ভারী লজ্জা করল রতনের। গাঁ দেশে দৃশ্যটা অবাক হয়ে দেখার মতোই। এক আকাঁড়া

মেমসাহেবকে সাইকেলে ডবলক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে রতন, এ নিয়ে রটনা হবে খুব।

কিন্তু বসতি ছাড়িয়ে পাকা রাস্তায় পড়তেই রোদ আর হাওয়া আর খোলামেলা আদিগন্ত বিস্তার সব অস্বস্তি উড়িয়ে দিল। মারিয়া এমন সুন্দর আলতোভাবে বসে আছে যেন সাইকেলের রডে চেপে যাওয়া তার বহুকালের অভ্যাস। তার সোনালি চুল হাওয়ায় উড়ে উড়ে ঝাপটা মারছে রতনের মুখে, গলায়। মারিয়ার কাঁধ মাঝে মাঝে দুলে দুলে এসে তার বুকে মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে। তার হাঁটু মাঝে মাঝে স্পর্শ করছে মারিয়ার জানুদেশ। এই আশ্চর্য সাইকেল-যাত্রা যেন ঘটছে এক স্বপ্নের ভিতরে। এ বোধহয় সত্য নয়।

মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল মারিয়া। খুশির হাসি।

ডু ইউ এনজয়?

ফ্যানটাস্টিক!

তৃপ্তির হাসি হাসল রতন। মনে হল, মারিয়ার জন্য সে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু।

মারিয়া মাঝে মাঝেই ফিরে দেখছে তাকে। প্রত্যেকবার একটু মোহিনী হাসি হাসছে। তার চোখ ভর্তি খুশি আর আনন্দের আলো। মুখ টেপা হাসিতে যেন মাঝে মাঝে বালিকা হয়ে যাচ্ছে সে।

সাইকেল যেন তাকে একটা স্বপ্নের ভিতরে নিয়ে চলেছে। এই যে রোদ হাওয়া, চারদিককার সবুজ এ যেন রোজকার চেনা পৃথিবীর নয়। এ মেয়েটা কি পরাণদার বউ? পৃথিবীতে কে কার? কে কার নিজস্ব মেয়েমানুষ বা পুরুষমানুষ? তার ম' কি এখনও তার বাবার বউ?

পাপ কথা আসে কেন মনে? ভারী জ্বালা হল তার। একটা ট্রাকটরকে পাশ কাটিয়ে সে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। ভারী আনমনা হয়ে যাচ্ছে। এরকম হওয়া উচিত নয় তো!

মাইল তিনেক যাওয়ার পর পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ ধারে মাঠের ভিতর কাঁচা রাস্তা ধরতে হল। খেত খামারের ভিতর দিয়ে মেটে রাস্তাটা বহু দূর গেছে। দানা শস্যের চাষ পড়েছে এখন। ছোলা, মটর, সর্ষে। চারদিক সবুজে সবুজ। মেটে রাস্তায় ঝাঁকুনি হচ্ছে খুব। মারিয়ার কি কষ্ট হচ্ছে?

মারিয়া, দি রোড ইজ ভেরি ব্যাড!

হাউ ফার ইজ দি স্পট?

ওয়ান মাইল।

দেন লেট আস ওয়াক।

এই হেঁটে যাওয়াটাও কী যে ভাল লাগছিল তার।

কিসের চাষ হচ্ছে জিজ্ঞেস করায় রতন ছোলা, মটর আর সর্ষের ইংরিজিটা চট করে মনে করতে পারল না। বেশ ভেবে দুটো বলতে

পারল, গ্রাম আর মাস্টার্ড।

তাদের চাষবাড়ি দেখে মারিয়া বলল, ইজ ইট এ র‍্যান্‌চ্‌ অর সামথিং?

র‍্যান্‌চ্‌ মানে জানে না রতন। অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসল।

চারদিকে সব তাদেরই জমি। অনেকটা জমি। চাষের সুবিধে এবং দেখাশোনার জন্য এখানে একটা খামারবাড়ি বানানো হয়েছিল। পাকা বাড়ি নয়। টিনের চাল, মাটির ভিটে, দড়মার বেড়া। একধারে ট্রাকটরের শেড। দু তিন জন কর্মচারী থাকে।

মূল ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। ফসলের সময় তার বাবা এসে এখানে থাকত দিনের পর দিন।

ধান কাটার সময় কিছু হাঙ্গামা হত আগে। সামাল দেওয়ার জন্যই বাবাকে থাকতে হত। খুব ডাকাবুকো লড়িয়ে লোক ছিল তার বাবা। কিন্তু সেই বাবা তো আর নেই।

ঘরটা এখনও বেশ সাজানোই আছে। এক ধারে বড় চৌকির ওপর তোষক গুটিয়ে রাখা। একটা ইজিচেয়ার আর গোটা দুই কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল। আলনা আছে, কুলুঙ্গিতে ঠাকুরদেবতার পট আছে, একধারে ডাঁই করে রাখা কিছু বস্তা।

শিবরাম দরজা খুলে দিয়ে খুব খাতির করতে লাগল। বিছানাটা পেতে দিল তাড়াতাড়ি। মেমসাহেব দেখে তটস্থ!

রতন বলল, পরাণদাদার বউ।

বউ? ওরে বাবা! বলে খুব তোষামোদের হাসি হাসতে লাগল। তারপর বেড়ার গায়ে গোঁজা একটা হাতপাখা টেনে এনে হাপুর হুপুর বাতাস করতে লাগল মারিয়াকে।

মারিয়া চারদিকে চেয়ে দেখছে। মুখে হাসি হাসি ভাব। মনে হল ভালই লাগছে বেশ।

কয়েকটা ডাব কেটে আনি দাদাবাবু। একটু জিরোও তোমরা।

রতন অবাক হয়ে বলল, এখানে ডাব কোথায় পাবে? ধারেকাছে তো গাছ নেই।

ওই তো দু' কদম দূরে পাঁচুই গাঁ। এক ছুটে নিয়ে আসছি। সাইকেল আছে, যাব আর আসব।

শিবরাম গেল তো এল গোপাল। কমবয়সী ছেলে। মুখে ফ্যালফ্যাল করছে হাসি। বলল, কী খাবে? ভাত রাঁধব?

না রে। বাড়ি ফিরে খাব।

তাহলে মুড়ি মেখে দিই? চা খাবে তো!

মারিয়া হয়তো ব্যাপারটা বুঝল। মাথা নেড়ে বলল, নট নাউ।

তারপরই রতনের হাত ধরে টেনে তুলে বলল, লেট মি সি দি প্লেস।

আলপথ ধরে ধরে তারা হাঁটল। অনেক হাঁটল। ফাঁকা মাঠঘাট,

আদিগন্ত বিস্তার। একটা মাঠের ধারে গাছের ছায়ায় দু'জনে বসলও কিছুক্ষণ, পাশাপাশি। মারিয়া এখন একটু উদাস। মাঝে-মাঝে গুনগুন করে কিছু গাইছে, বেশ সুরেলা গলা। আবার চুপ করে থাকছে। পাশেই রতন, তবু রতনকে যেন এখন ভুলেই গেছে মেয়েটা। একটু হিংসে হচ্ছিল রতনের। তবে মেমসাহেবরা বোধহয় এরকমই হয়। গাছের ফাঁক দিয়ে চিকড়িমিকরি রোদ এসে পড়ছে ওর মুখে।

তোমার ভাল লাগছে মারিয়া?

হুঁ।

রতন চুপ করে রইল। আর তো তার কিছু বলার নেই।

অনেকক্ষণ বাদে মারিয়া হঠাৎ খুব আস্তে করে তার দিকে মুখ ফেরাল। রতন অবাক হয়ে দেখল, সেই মেয়েটা কেমন বদলে গেছে। চোখে একটা সম্মোহিত দৃষ্টি। যেন এই পৃথিবীতে, এই বাস্তবতায় নেই। কোনও স্বপ্নের মধ্যে ডুব দিয়ে আছে।

কী হয়েছে মারিয়া?

মারিয়ার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু প্রথমটায় কোনও শব্দ হল না। তারপর যেন হাঁফ ধরা গলায় ফিসফিস করে বলল, কিস মি! প্লিজ কিস মি...

রতন শিউরে উঠল। কী বলে রে মেয়েটা! সে কি পারে ওসব? ছিঃ ছিঃ।

মারিয়াই তাকে আচমকা টেনে নিল নিজের ওপর। তারপর তপ্ত, শুকনো দুই ঠোঁট চেপে ধরল তার ঠোঁটে। ভয়ে, লজ্জায় রতন বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেত। কেন যে হল না।

আচমকাই ফের ছেড়ে দিল তাকে। বলল, লেট আস গো।

দুপুরে যখন সাইকেলের রডে মারিয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল রতন তখন তার বুকে ঝড়। জীবনে প্রথম এক নারী তাকে চুম্বন করেছে। কিন্তু তার স্মৃতি তাকে চিরকাল বোধহয় কুরে কুরে খাবে। কী হল? কেন হল এটা? সে তো উপভোগ করেনি! এক তপ্ত ঠোঁট তার ঠোঁটে আশ্রয় খুঁজেছিল বটে, কিন্তু আশ্রয় দেয় কেমন করে? এ যে তার বউদি, সম্পর্কে গুরুজন! এ কি পাপ হল? কলঙ্ক লেগে রইল তার চরিত্রে?

মারিয়ার কোনও বিহ্বল লক্ষ করল না সে। চুমু খাওয়ার আগে যেমন, পরেও তেমনি সহজ। কোনও লজ্জা বা অনুশোচনা নেই। যেন কিছুই হয়নি। কিচ্ছুটি নয়।

একটা ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে এল রতন। যেন খুব জ্বর আসছে তার। যেন হাত-পা বড় শিথিল। মাথায় কোনও বুদ্ধি কাজ করছে না। কেমন যে লাগছিল।

ঘরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল সে। ভাল লাগছে না, কিছুই ভাল লাগছে না তার।

সারাদিন আর মারিয়ার সঙ্গে দেখাই হল না তার। বিকেলে পরাণদা মারিয়াকে নিয়ে পাশের গাঁয়ে শীতলা পূজার ফাংশানে গাইতে গেল। হাজার টাকায় নাকি চুক্তি হয়েছে, কত রাতে ফিরেছিল কে জানে। রতন তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাঁচা ঘুমটা ভাঙল বাবার চেঁচামেচিতে। মধ্যরাতে পাড়া জানান দিয়ে বাবা ঘরে ফিরছে, রেন্ডির বেটি রেন্ডি! রেন্ডি শালী হারামি কুত্তার বাচ্চা! শালী, তোর...

রতন আজ ধৈর্য হারিয়ে উঠে এল।

বাবা!

কে রে?

আর একটাও কথা বলবে না। চুপ করে শুয়ে থাকো। একদম চুপ!

বাবা খুব অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কখনও রতন এভাবে বলেনি তার বাবাকে। চেয়ে থেকে তার বাবা বলল, কী হয়েছে?

চুপ করো। চেঁচাবে না।

অ। তা সেকথা বললেই তো হয়। চেঁচাচ্ছিস কেন?

আর কথা বলবে না, একদম নয়।

বাবা বিছানায় ঢুকে গিয়ে খুব স্তিমিত গলায় বলল, কারওটা খাই না পরি? ঠিক আছে, বলব না।

শুয়ে পড়ো।

ঠিক আছে।

রতন দু' ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিল। না, বাবা আর টুঁ শব্দটি করল না। নাকের ডাক শোনা গেল একটু বাদেই।

খুব ভোরবেলা পরাণদা আর মারিয়া চলে গেছে। বোলপুর না কোথায় যেন বাউলদের মচ্ছবে যাবে। সকালে ফাঁকা ঘরটার দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে দেখছিল রতন। জ্যাঠাইমা গোবরছড়া আর গঙ্গাজল দিয়ে ঘর পরিষ্কার করাচ্ছে। দু'টো ঝি খ্যাংড়া ঝাঁটা দিয়ে ঘর থেকে বিদেয় করছে ম্লেচ্ছ মেমসাহেবের স্পর্শ আর গন্ধ।

অত সহজে যদি রতনও পারত! তাই কি পারে? ঠোঁট এঁটো হল, মন ভরে গেল গ্লানিতে। অথচ মন, চোখ ভরে রয়েছে মারিয়া। এত গ্লানির ভিতরেও তীব্র এক নিষিদ্ধ আনন্দের সূচিমুখ।

মন্থর, শিথিল পায়ে উদাস মুখে বেরিয়ে পড়ল রতন। ভাল লাগছে না। বড় শূন্য লাগছে চারদিক। বড্ড ফাঁকা। ভারী নিঃসঙ্গ লাগছে আজ।

উল্টো দিক থেকে একটা সাইকেল আসছিল, দেখতে পায়নি রতন। কাছ বরাবর এসে ঘ্যাঁস করে থামল। অরুণদা সাইকেল থেকে নেমে বলল, অ্যাই, তুই পার্টি অফিসে যাস না কেন রে? অ্যাঁ কী হয়েছে তোর? তিন-চার সপ্তাহ তোকে দেখছি না, একটা মিটিংও অ্যাটেন্ড করিসনি। কী ব্যাপার?

রতন লজ্জা পেয়ে বলল, এমনি যাইনি।

তার মানে? এত অ্যাবসেন্ট হলে লোকে কী বলবে? কলকাতার দু জন কমরেড এসে চারদিন ক্লাস নিয়ে গেল, থাকলে কত কী জানতে পারতিস।

রতনের কোনও অজুহাত নেই তেমন। সত্যিই তার ইচ্ছে হয়নি বলে যায়নি। কিন্তু কথাটা অরুণদা বিশ্বাসই করবে না। পার্টি অফিসে যেতে কারও যে অনিচ্ছে হতে পারে এটাই অরুণদার কাছে অবিশ্বাস্য। কারণ পার্টিই লোকটার ধ্যানজ্ঞান। পার্টি প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে অরুণদাকে কদাচিৎ কথা বলতে শোনা যায়। লোকটা হাসি-ঠাট্টা করে না কখনও, রঙ্গ-রসিকতা মস্করা বোঝে না, সদাসর্বদাই ভারী সিরিয়াস মুখ করে থাকে। পার্টির জন্য লোকটা বিয়ে করল না, ক্যারিয়ারের কথা ভাবল না, সংসারের দায়দায়িত্ব নিল না। কিন্তু অন্য সবাই যে ঠিক তার মতো নয় এ কথাটা অরুণদাকে বোঝানোই যায় না।

সাইকেল টেনে তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে অরুণদা বলল, তুই একটা ব্রাইট ছেলে। তোর ওপর আমার অনেক আশা।

এসব হল ছেলেভোলানো কথা। স্তোকবাক্য। নিজের ভিতরে কোনও উজ্জ্বলতা অনুভব করে না রতন। সে ক্লাস করেছে, মিটিঙে গেছে, অরুণদার সঙ্গে থেকে থেকে শিখেওছে অনেক কিছু, কিন্তু সাম্যবাদ ব্যাপারটা যে সে ভাল বোঝে এমন নয়। তার মনে হয়, সাম্যবাদ এক স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সত্যের ভূমিতে দাঁড় করানো বড় সহজ নয়।

অরুণদা শুনে একবার তাকে বলেছিল, হ্যাঁ, সাম্যবাদ একটা স্বপ্নই। তবে এটা আবার একটা অঙ্কও বটে। যদি প্রত্যেকটা স্টেপ নির্ভুলভাবে কষিস তাহলে অঙ্কের ফল মিলে যাবে। কিন্তু যদি কোনও একটা স্টেপে একটা ছোট্ট ভুলও থেকে যায় তাহলেই অঙ্কের ফল ভুল হয়ে যাবে। আমাদের কাজ হল প্রত্যেকটা স্টেপ ঠিক ঠিক মতো কষা। আর মনে রাখতে হবে এই অঙ্কটা একজন কষছে না, সবাই মিলে কষছে। এক একটা স্টেপ কষার জন্য এক একটা পর্যায়ের কর্মী। অঙ্কটাকে আমরা ফলের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি।

কথাগুলো কিছু খারাপও নয়। একটু শুকনো, কিন্তু খারাপ নয়। সে তো ভেবেই রেখেছে বাড়ি ছেড়ে একদিন সে পার্টি অফিসেই গিয়ে উঠবে। দলের নিয়ত কর্মী হিসেবে কাজ করে যাবে। বিষয়সম্পত্তির ভাগ তার চাই না। অরুণদার মতো অত ডেডিকেটেড হয়তো হয়ে উঠতে পারবে না, তবু কিছু নিয়ে তো থাকা যাবে।

তার পাশে পাশে কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে অরুণদা বলল, তোর তো কত সুবিধে। সংসারের চিন্তা নেই, দায়দায়িত্ব নেই। তোর কিসের পরোয়া। পার্টিকে আর একটু সময় কি তুই দিতে পারিস না?

রতন বলল, পারি অরুণদা।

বাড়ি থেকে আপত্তি উঠছে না তো রে?

রতন একটু হাসল, বলল, না।

বাড়ি থেকে আপত্তি ওঠেনি তা নয়। জ্যাঠাইমা খুঁত খুঁত করত, এসব দলটল করা কি ভাল? কচি ছেলেটা! আজকাল পার্টিতে পার্টিতে যা খুনোখুনি হয়।

জ্যাঠা বলল, আরে না না। পার্টিতে বাড়ির একটা ছেলে থাকা ভাল। তাতে অনেক সুবিধে হয়।

কী সুবিধে হচ্ছে?

বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করতে গেলে পার্টি না ধরলে কি চলে? ওরাই তো ভগবান। বাড়ির একটা ছেলে পার্টিতে থাকলে অনেক সুবিধে। পার্টি হাতে থাকে।

এই অঙ্কটা খুব সোজা। পার্টি করো, বিষয়সম্পত্তি বাঁচাও।

রতনের আজ হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল অরুণদাকে ময়নাদির কথা জিজ্ঞেস করতে। বাড়াবাড়ি হবে ভেবে করল না। কিন্তু এক একদিন তার খুব ইচ্ছে করে, ব্যাপারটা নিয়ে অরুণদার সঙ্গে একটা ঝগড়া করতে।

আজকের কথা তো নয়। সেই কবে থেকে ময়নাদি এই লোকটার জন্য হাপিত্যেশ প্রত্যাশায় ছিল। তাদের নাকি কিশোরপ্রেম। কিন্তু দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে অরুণদার আর সময় হল না।

গাঁ-গঞ্জের প্রথা ভেঙে ময়নাদি লজ্জার মাথা খেয়ে অরুণদার সঙ্গ পাবে বলে পার্টিতেও নাম লেখাল। কিন্তু যতবার অরুণদার কাছে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছে ততবারই অরুণদা নাকি বলেছে, কমরেড ময়না, এটা হয় না।

কমরেড শব্দটার ওপরেই খেপে গিয়েছিল ময়নাদি। তাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিল, কমরেড শব্দটা আমার কাছে মুগুরের মতো লাগে বুঝলি। ও যতবার আমাকে কমরেড বলে ডাকে আমার যেন কেমন মাথা ঝিম ঝিম করে। কেন ডাকে রে?

সত্যিই তো! কেন ময়নাদিকে কমরেড বলে ডাকে অরুণদা? এ কি প্রত্যাখ্যানের ভাষা?

গাঁ-দেশের মেয়ে তো আর অনন্তকাল বসে থাকতে পারে না। বয়স হয়ে গেলে নিন্দে হয়। অবশেষে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বর্ধমানের এক বরের গলায় মালা দিয়ে ময়নাদি চলে গেছে।

অরুণদার তবু কোনও বিকার নেই।

তেমাথা থেকে অরুণদা আর সে আলাদা হল।

আজ একটু একা থাকতেই ভাল লাগছে তার। তার ভিতরে নিভৃতে বার বার ঝঙ্কার তুলছে মারিয়া। কেন, কে জানে।

মা তাদের দুই ভাইবোনকে দু-পাটি ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে রেখে চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের মুখে রেখে গেছে নিজের মুখের নির্ভুল ছাপ। ডাকের সুন্দরী ছিল মা। তারা দুই ভাইবোন সেই সৌন্দর্য বহন করছে। হয়তো অভিশাপের মতোই। কিন্তু উপায়ও তো নেই। তারা ওই মায়েরই ছেলে-মেয়ে।

রতন রাস্তায় বেরলে তাই মেয়েরা তাকায়, বউরা তাকায়, নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে। তাকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই পাড়ায় বে-পাড়ায়। মেয়েরা ভাব করতে চেয়েছে কতবার। ফস্টি নস্টি জিনিসটা রতনের কোনও দিনই ভাল লাগে না। সে ঠিক ওরকম নয়।

তবে জ্যাঠাইমা আজকাল বলছে, রতনটার এবার বিয়ে দেওয়াটা দরকার। সাবিত্রী মুখপুড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে ওদের ঘরে লক্ষ্মী নেই। বড় ঠাকুরপো কেমনধারা হয়ে রইল। রতনের বউ এলে মাথা ঠাণ্ডা হবে। ঘরেরও শ্রী ফিরবে।

জ্যাঠা গয়ারাম প্রস্তাবটা ফেললেন না। আর দুই ভাই শিবরাম আর রামরামকে ডেকে মিটিং করা হল।

জ্যাঠামশাই বললেন, প্রস্তাবটা আমি কিছু খারাপ দেখছি না। রতনের বড় দু'জন আছে বটে, আমার দুই অকাল কুষ্মাণ্ড। পরাণটা তো বিবাগীই হয়ে গেল। আর জুড়ান তার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু কবে করবে ঠিক নেই। তা বলে তো আর আমরা বসে থাকতে পারি না। অভিরামের সংসারটা ভেঙেই যাচ্ছে। আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে, নাকি?

শিবরাম আর রামরাম বড়দার ওপর কখনও কথা কয় না। প্রস্তাবটা তারাও খারাপ বিবেচনা করেনি। এ বাড়ির ছেলে বেকার হলেও কিছু নয়। পারিবারিক আয়ের অংশেই দিব্যি হেসে-খেলে চলে যাবে।

ছোট খুড়িমা আনন্দময়ীর সঙ্গে রতনের ভাব বেশি। খুড়িমার বয়সটাও বেশি নয়। মেরেকেটে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। অনেকটা বউদি-বউদি ভাব।

আনন্দময়ীই তাকে ঘরে ডেকে সব খুলে বলল, তোর বিয়ের কথা চলছে, বুঝলি! পছন্দের কেউ থাকলে এইবেলা আমাকে বলে রাখ। তোর কাকাকে বলে ব্যবস্থা করব।

রতন কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলল, খেপেছ! এই বয়সে কেউ বিয়ে করে?

কেন করবে না? তোর বাপ-ঠাকুর্দা করেনি?

সেই আমল আর নেই ছোট খুড়ি। উস জমানা বীত গয়া।

শোন, পাকামি করিস না। মেজো ভাসুরঠাকুর কেমন পাগলা-পাগলা হয়ে আছে দেখছিস না। ছেলের বউ এলে দেখবি, সামলে উঠবে।

ঠিক উল্টো। বউ এসে প্রথম রাত্তিরেই শ্বশুরের ভাষণ শুনে পালিয়ে

যাবে। ও কাজও কোরো না।

হঠাৎ ছোট খুড়ির চোখ দুটো ভারী ছলছল করতে লাগল। ভারী গলায় বলল, হ্যাঁ রে, একটা কথা বলবি আমায়?

কী কথা?

মেজদিকে আমি দেখিনি। কিন্তু এই যে মেজদা তোর মা-কে এত গালাগাল করে সে কি শুধু রাগ থেকে?

তাছাড়া আর কী বল!

আর কিছু নয়?

রতন অবাক হয়ে বলে, আর কি বল তো! পুরুষ মানুষের তো একটা স্বাধিকারবোধ থাকেই। মেয়েমানুষকে তারা নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে। সেখানে কেউ থাবা দিলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ও হচ্ছে পুরুষের অহঙ্কার, বুঝলে?

আর কিছু নয়? ঠিক জানিস?

কেন জ্বালাচ্ছ খুড়িমা, আমি যা বুঝেছি বললাম। ওই লোকটাকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

আমার যা মনে হয় বলব? বললে রাগ করিস না বাবা। আমি ভাবি এমন ভালবাসাও বুঝি কম লোক বাসতে পারে।

রতন হাসল, খুব বুঝেছ। এই বুঝি ভালবাসার নমুনা! রাত্তিরে যখন গালাগাল করতে করতে ফেরে তখন শোননি?

শুনব না কেন? শুনে কানে আঙুলও দিই। কিন্তু হ্যাঁ রে, চৌদ্দ বছর কেউ রেগে থাকতে পারে? দু'-চার ঘণ্টা, দু'-চার দিন পারে। কিন্তু চৌদ্দ বছর ধরে পারে না। রাগ এতদিন টেকে না, কিন্তু ভালবাসা টেকে, বুঝলি?

না, রতন বোঝেনি। তবে তর্কও করেনি। ছোট খুড়িমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছে, তোমার মনটা ভাল তো, তাই সবাইকে ভাল দেখ।

তোর বাবা কিন্তু আর বিয়েও করেনি, এটাও তো একটা কথা।

বাবার কথা বাদ দাও খুড়িমা। আমরা ভাইবোন বাবার জন্য জ্বলেপুড়ে মরছি। মায়ের জন্য আমাদেরও লজ্জা আছে। কিন্তু তারপর রোজ যদি কেউ ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তোলে আমাদের কী অবস্থা হয় বল তো! দিদি তবু পালিয়ে বেঁচেছে। আমিও পালাব।

ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। বিয়েতে রাজি হয়ে যা। ভাল বউ যদি হয় তবে সংসার বেঁধে দেবে দেখিস।

মাথা নেড়ে রতন বলেছে, আমি বাঁধা পড়তে রাজি নই খুড়িমা। কাকা-জ্যাঠাদের বারণ করে দিও। চাপাচাপি করলে কিন্তু ঠিক পালিয়ে যাব।

ছোট খুড়ি ছলছলে চোখে চেয়ে বলেছে, যাবি কেন? পালালেই বুঝি সব সমস্যা মেটে?

না মেটে না। আমাদের সমস্যা মিটবারও নয়। বিয়েটিয়ে করে ব্যাপারটা আরও জটিল করে তলতে চাই না।

ছোট খুড়িমা হয়তো ভুলই বলেছে। কিন্তু এটাও ঠিক তার নয় বছর বয়সের সময় বাবা অন্য মানুষ ছিল। তখন মায়ের চেয়েও সে বাবারই ন্যাওটা ছিল বেশি। সাইকেলের রডে চাপিয়ে অনেক সময়ে বাবা তাকে কোথায় কোথায় নিয়ে গেছে। ওই চাষ বাড়িতে গিয়েও সে বাবার সঙ্গে থেকেছে কতবার। সেইসব স্মৃতি অবশ্য চৌদ্দ বছরে ধূসর হয়ে গেছে।

বড় পরিবারে সবাই মিলে থাকার একটা সুবিধে আছে। তার মা চলে যাওয়ার পর জায়গাটা শূন্য হল বটে, কিন্তু একেবারে জলে পড়ে যায়নি তারা। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোয় জ্যাঠাইমা আর বড়দি মাধুরী তাদের আগলে নিয়েছিল। জ্যাঠাইমার আদিখ্যেতা নেই। কিন্তু কোনও কর্তব্যে অবহেলা করে না কখনও। বড়দি পরাণদারও বড়। বড়দি খুব সামলে রাখত তাদের। গল্প করে, ছড়া বলে, নানাভাবে ভুলিয়ে রাখত। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার সময় বড়দি তাকে বলেছিল, যদি খুব মন খারাপ হয় তাহলে আমার কাছে চলে আসিস। বড়দির বিয়ের আগেই অবশ্য দু' দুটো খুড়িমা এসে গেছে। বড় খুড়িমা বোকাসোকা মানুষ। একটু কুঁদুলিও আছে। ছোট খুড়িমা ভীষণ ভাল। এইসব নানা বিকল্প দিয়ে মায়ের অভাব পূরণ হয়েছে অনেকটা। তেমন করে আর মনেও পড়ে না, মন খারাপও করে না মায়ের জন্য। শুধু মনে হয়, এ বাড়ির আর সব বউ স্বাভাবিক হল, মা কেন হল না! নাকি সুন্দরী হওয়াটাই মায়ের কাল হল?

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছিল রতন। বড্ড নাড়িয়ে দিয়ে গেছে তাকে মারিয়া। এত নাড়া খায়নি বহুকাল। ঠোঁটে এখনও তার স্পর্শ লেগে আছে।

বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। গরম লাগছিল খুব। জামাটা খুলে রোদে দিয়ে আদুর গায়ে বারান্দায় বসে জিরোচ্ছিল রতন। দেখল, ননীদাদু গামছা পরে গাড়ুহাতে দক্ষিণের ঘর থেকে বেরোচ্ছে। ননীদাদু বাবা-জ্যাঠাদের সম্পর্কে কাকা। এ বাড়ির আশ্রিত। তিনকুলে কেউ নেই। কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়া তেমন সমস্যা নেই তার।

রতনকে দেখে এগিয়ে এসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে বলল, টিকবে না। বুঝলি! টিকবে না।

কী টিকবে না দাদু?

ওই বিয়ে। ও কি বিয়ে হল বাবু? কাল মাঝরাতে তো ঝগড়া হচ্ছিল।

কার কথা বলছ দাদু?

ওই পরাণের কথাই বলছি। গান্ধর্ব বিয়ে তো, ও তেমন টাইট হয় না। তাই বলছি, দেখে নিস, এ বিয়ে টিকবে না।

তিন

তোর বাড়িতে আজকাল পোস্ত রান্না হয় নাকি রে? অ্যাঁ!

ভারী অপরাধী ভাব করে লাজুক মুখে মহেন্দ্র বলল, ওই হয়েছে একটু।

এ বাজারে যে পোস্ত খায় সে তো লটারি মেরেছে রে। নয়তো লুকিয়ে আফিঙের চাষ করে।

মহেন্দ্র বলল, আহা সেই কি আর আগের মতো কাই-কাই রান্না! এ নামেই পোস্ত চচ্চড়ি। এক চিমটি পোস্তর সঙ্গে রাই সর্ষে মিশিয়ে গায়ে গায়ে মাখা রান্না।

দেড়শো টাকা না কত করে যেন কে জি শুনতে পাই।

তা হবে। আমাদের মনো মুদির দোকানে প্যাকেটে পাওয়া যায়। একরত্তি থাকে, এক টাকা করে প্যাকেট।

দিনকাল কী পড়ল রে মহিন্দির! স্বাদ সোয়াদ সব ভুলতে বসেছি। পোস্ত ভুলে গেলুম, গাওয়া ঘি ভুলে গেলুম, ক্ষীরপুলি ভুলে গেলুম, ল্যাংড়া আম কি ট্যাংরা মাছ সেও মনে পড়ে না রে, শেষ কবে খেয়েছি। দাও দিকি বউমা, তোমার পোস্ত চচ্চড়ি আর এক ফোঁটা। বেশ হয়েছে খেতে।

লবঙ্গ ঘোমটা টেনে সামনেই বসা। হাতা ভরেই খপ করে দিল পাতে।

আহা-হা কর কি! অত নয় তা বলে।

লবঙ্গ নরম গলায় বলল, খান না কাকা, অনেক আছে।

অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে মা। এসব খেলে নিজেকে অপরাধী লাগে।

মাছের ঝোলটা কিন্তু আমার মেয়ে রেঁধেছে।

রাঁধে বুঝি?

তা রাঁধবে না? পনেরো পুরে ষোলোয় পা দিয়েছে।

সতীশ ব্রহ্ম একটু হেসে বলল, মেয়েদের বয়স যেন হুড়মুড় করে বেড়ে যায়। আমার মেয়ে দুটোর বেলাতেও তো দেখেছি। এই দেখলুম ফ্রক পরে কদমতলায় এক্কা দোক্কা খেলছে, এই দেখলুম শাড়ি পরে ধিঙ্গি হয়ে গেল।

লবঙ্গ বলল, সেটাই তো ভাবনা কাকা। বয়স মোটে বসে থাকছে না। আমার তো এখন থেকেই হাত-পা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

শাস্ত্রে কী বলে জান? মেয়ে না জন্মালে নাকি মায়ের গর্ভ শুদ্ধ হয়

না। কথাটা তলিয়ে বুঝলে দেখবে মেয়েদের মূল্য কতখানি। সমাজের দোষে, প্রথার দোষে সেই মেয়েই এখন মা-বাপের গলার কাঁটা। ভাবলে নিজেদের ওপর ভারী ঘেন্না আসে। আর বিয়ে দিয়ে পার করলেই কি শান্তি পাবে মা? কোন ঘরে, কোন বরে গিয়ে পড়ে। সেও আর এক দুশ্চিন্তা।

তাই তো কাকা, সে সব ভেবেই তো বুক শুকিয়ে যায়। আপনি তো নানা জায়গায় ঘোরেন, একটু দেখবেন তো। কম বয়সে শ্বশুরবাড়ি গেলে অশান্তি একটু কম হয়।

বাঃ, মাছের ঝোলটা রেঁধেছে তো বড্ড ভাল। না, হাতে লক্ষ্মী আছে।

লবঙ্গর মুখে একটু অহঙ্কারের হাসি ফুটল। বলল, লেখা-পড়ায় তেমন নয়। তবে অন্য সব দিকে দিয়ে— মা হয়ে কি আর বলব— খুঁত পাবে না কেউ।

সতীশ ব্রহ্ম খেতে খেতে বলল, বয়সটা কত বললে যেন।

পনেরো পুরো দু' মাস চলছে।

আজকাল কি সব আইনটাইন হয়েছে যেন। আঠেরোর আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়া বারণ। মহিন্দির কিছু জানিস?

ও কেউ মানে না। আকছার পনেরো-ষোলোয় বিয়ে হচ্ছে গাঁ-দেশে।

তা তো বটেই। আইন তো আর সবার জন্য নয় রে বাবা। যারা অন্ধকারে পড়ে আছে তাদের আবার আইন কিসের?

আর একটু ঝোল দেব কাকা?

না না। দুপুরে বেশি খেলে আইঢাই হয় বড্ড। বয়সও হচ্ছে।

বড্ড খাওয়া কমে গেছে আপনার। আগে চাট্টি খেতে পারতেন।

তা পারতুম।

আর এক টুকরো মাছ দিই কাকা? আর চাট্টি ভাত।

ও কম্মও কোরো না। আজকাল পেটে সয় না। কথায় আছে না, বেশি খেতে চাইলে কম খাও?

পায়েস আছে কিন্তু।

ও বাবা! এরপর আবার পায়েস।

কী এমন খাওয়ালাম বলুন তো! গরিবের ঘরে আয়োজনই বা কী!

সতীশ ব্রহ্ম হাসিমুখে বলল, গরিব কি না তা কোনওদিনই তো লোককে বুঝতেই দিলে না বউমা। তোমার ঘরদোরের লক্ষ্মীশ্রীর কথা আমি সবাইকে বলি। আমাদের মহিন্দিরের বউ টানাটানির সংসার কাউকে টেরই পেতে দেয় না। সবসময়ে যেন সবকিছু উপচে পড়ছে।

কী যে বলেন কাকা।

মেয়েকে এই তুকটা যদি শিখিয়ে দিতে পারো তবে জীবনে কখনও কষ্টে পড়বে না। লেখাপড়া শিখে লবডঙ্কা হয় মা, সংসারের কর্ত্রী হতে

অন্য শিক্ষা লাগে। তুমি তো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়োনি, যারা পড়েছে তাদের সংসারে গিয়ে দেখে এসো, ভূতের নেত্য হচ্ছে।

আপনি বড় লজ্জা দেন কাকা।

একটা কথা কইব বউমা? ভেবে দেখো।

বলুন না।

একটা মাহিষ্য পাত্র আছে। বেশি দূরেরও নয়। বিশখানা ট্রাকের মালিক, দু'-দু'টো চালু মোটর পার্টসের দোকান। দুই ভাই মিলে ব্যবসা করে। এ হল বড়। অমন সচ্চরিত্র ছেলে পাবে না। মদ সিগারেট ছোঁয় না। বয়সেও তেমন বেমানান হবে না। ছেলের এই আঠাশ উনত্রিশ বয়স। ভেবে দেখতে পারো।

মহেন্দ্র বলল বড়লোক! তাহলে কি আর আমার মেয়েকে নেবে?

ওরে, ওদের তো টাকার খাঁই নেই। মেয়ে দেখে নেবে।

তাহলে দিন না লাগিয়ে।

তুই বললে তো হবে না। বউমা বলুক।

লবঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি যদি ভাল বলে বিবেচনা করেন তাহলে অমতের কী?

আছে মা। অমতের কথাও একটু আছে। সেইটেই বলি। ছেলের আগে বিয়ে হয়েছিল। বউটা আচমকা মরে গেল কিনা।

ও মা! মরল কিসে?

সেইটেই গোলমেলে ব্যাপার। ওই জন্যেই বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকছিল। বউটা মরেছে ফাঁসি দিয়ে।

বাবা গো!

আগেই ভড়কে যেও না। ভেঙে বলতে দাও। সেই মেয়ের বিয়ের আগে কোন একটা ছেলের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক ছিল। মা বাবা এই ছেলের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেয়। কান্নাকাটি করত, স্বামীর সঙ্গে বনত না। শেষ অবধি ওই কাণ্ড। বিয়ের চার মাসও পোরেনি। ছেলেটা কিন্তু নির্দোষ।

লবঙ্গ একটু ফ্যাকাসে মুখে বলে, কিন্তু আত্মাটা তো শান্তি না পেয়ে ঘুরছে। যদি কিছু খারাপ করে?

তাই তো ভেবে দেখতে বলছি। আমার কথা যদি শোনো, তাহলে বলি, অমন ছেলে কিন্তু পাবে না। লাখে একটা হয়। বিয়েটাই ভুল করে ফেলল। তাতেও অবশ্য তার দোষ নেই, সম্বন্ধ এনেছিল তার আপন পিসি। বউ ফাঁস দেওয়ায় থানা পুলিশ হয়ে কী নাকালটাই হতে হল বেচারাকে।

মহেন্দ্র বলল, তা ওরকম তো কতই হয়। এ ছেলে কি আর পড়ে থাকবে?

সতীশ ব্রহ্ম পায়েসের বাটি টেনে নিয়ে বলল, মেয়ে যে সুখে থাকবে

তা তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। সম্বন্ধ আসছেও মেলা। পাশ-করা মেয়ে, গান-জানা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু ছেলে একটু বেঁকে বসে আছে। ঘরপোড়া গরু তো। ভয় পাচ্ছে। তবে আমাকে খুব মান্যগণ্য করে। আজকালকার ছেলেদের মতো সবজান্তা ভাব নেই। এত খোলামকুচির মতো টাকা, তা তারও কোনও গুমোর নেই।

মহেন্দ্র বলল, রাজি কি হবে?

সে ভার আমার। বললুম না, আমাকে খুব মানে! তোর আর কিছু না থাক, মেয়ের জোর তো আছে। অমন সুলক্ষণযুক্ত মেয়ে ক'টা হয়? সেই জন্মাবধি তো দেখে আসছি।

আমার অবস্থা তো দেখছেন। খাঁই থাকলে তো পেরে উঠব না।

খাঁই! খাঁই কিসের? ছেলের যে টাকা পয়সার অভাব নেই সে তো শুনলি। দু ভাইয়ের দু-দু'খানা গাড়ি। বাড়িতে চার পাঁচটা ঝি চাকর। একটা বোন আছে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে কবে। মা বাপ বেঁচে আছে তবে তাদের আলাদা মহল। কোনও ঝামেলা নেই। বিয়ে হলে হিমি রাজরানির মতো থাকবে। এখন ভেবে দ্যাখ। কিছু লুকোলুম না। তবু খোঁজখবর করে দেখতে পারিস। সদরে কোতোয়ালির পিছনেই বিরাট দোতলা বাড়ি। বিমান রায় বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

লবঙ্গ জুলজুল করে চেয়ে ছিল। এতক্ষণ কথা কয়নি। এবার বলল, বেশি টাকাও কি ভাল কাকা? আমার হিমি তো গরিব ঘরের মেয়ে। অত ঐশ্বর্যের মধ্যে গিয়ে পড়লে ঘাবড়ে যাবে না?

হাঃ হাঃ করে হাসল সতীশ ব্রহ্ম। মাথা নেড়ে বলল, বেশ বলেছ। কথাটা ভেবে দেখার মতো। অবস্থার খুব তফাত হলে অসুবিধে হওয়ারই কথা। তাই বলছি, বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তে যা করার কোরো। তবে বেশি দেরি করলে হবে না। অমন পাত্র তো আর বেশিদিন পড়ে থাকবে না।

লবঙ্গ হঠাৎ করে বলল, ছেলের চেহারা কেমন কাকা? হিমির পাশে মানাবে?

সতীশ ফের হাঃ হাঃ করে হাসল। বলল, শোনো কথা! হিমির পাশে মানায় শুধু রাজপুত্তুর। সে আর কোথায় পাবে বলো! তা ছেলে দেখতে কিছু খারাপ নয়। একটু নাটা এই যা।

নাটা মানে! খুব বেঁটে নাকি?

না মা, চোখে পড়ার মতো কিছু নয়। গড়পরতা ধরে নাও। এই ধরো কেন আমার কাঁধ সমান হবে।

আপনি তো লম্বা মানুষ।

সেই কথাই বলছি। আমার মাপে নাটা। কিন্তু বিসদৃশ নয়। আমি বলি কি, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নেওয়াই ভাল। সদর তো এক ছুটের রাস্তা। বাসে ঘণ্টাখানেক কি একটু বেশি। একবার ঘুরেই আয় না মহিন্দির।

তা গেলে হয়। সদরে কাজও আছে একটু। কাল পরশুই যাব।

লবঙ্গের চিন্তিত মুখখানার দিকে চেয়ে সতীশ ব্রহ্ম বলল, শোনো বউমা, তোমাদের সঙ্গে তো আজকের সম্পর্ক নয়। আমার জমিটুকু সেই কবে থেকে মহিন্দির দেখেশুনে রাখছে। চাষবাস করে ফসলের হিসেব কষে টাকা চুকিয়ে দিচ্ছে। খোরাকির চাষ পৌঁছে দিয়ে আসছে। লেনদেনের ভিতর দিয়ে যে সম্পর্কটা তৈরি হয় তা বড় পাকা। তোমাদের কোনও খারাপ হয় তাই কি চাইতে পারি? মহিন্দির কোনও দিন ঠকায়নি আমাকে, আমিই কি তাকে ঠকাতে পারি?

লবঙ্গ লজ্জা পেয়ে বলল, তা নয় কাকা। আপনাকে আমরা আপনজন বলেই তো ভাবি।

ওরে মহিন্দির, তুই বরং পরশু সকালের দিকেই সদরে আয়। আমিই যাবোখন। বাজারে সুখেনের দোকানে খোঁজ করিস আমাকে। আমি সঙ্গে থাকলে আর তোকে আলায়-বালায় ঘুরতে হবে না।

খাওয়া শেষ করে সতীশ ব্রহ্ম আর মহেন্দ্র উঠে পড়ল।

ভিতরে দালানের দিককার দরজার আড়াল থেকে চট করে সরে গেল সেবন্তী। এক ছুটে দোতলায় উঠে কোণের ঘরে গিয়ে ঢুকল হাঁফাতে হাঁফাতে।

এই দিদি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

বিছানায় উপুড় হয়ে একখানা বই পড়ছিল হিমি। শরৎচন্দ্রের নভেল। চোখ একটু ছলছল করছিল তার। ঘোর থেকে উঠে অবাক হয়ে বলল, কী ঠিকঠাক হয়ে গেল?

তোর বিয়ে।

কথাটা বুঝতেই পারল না হিমি। বলল, কী ইয়ার্কি হচ্ছে?

মাইরি, মা-কালীর দিব্যি।

যাঃ, মারব থাপ্পড়।

সত্যি রে, সত্যি, সত্যি, সত্যি, তিন সত্যি। বর বেঁটে, বুড়ো, দোজবরে। আরও শুনবি? আগের পক্ষের বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তার ভূত ও বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়।

কী পাগলের মতো বকছিস যা তা?

নিজের কানে শুনে এলুম যে!

কে বলল তোকে?

হ্যাঁ, আমাকে বলবে কিনা। চুরি করে শুনেছি। ব্রহ্মদাদু খবর এনেছে। বাবা যাচ্ছে বরের বাড়ি।

শরৎচন্দ্রের ঘোর কাটিয়ে উঠল হিমি। বলল, সত্যি বলছিস?

মা-কালীর দিব্যি।

মা রাজি হয়ে গেল?

হবে না? বরের যে অনেক টাকা। কুড়িটা ট্রাক। গাড়িটাড়ি আছে।

সেই জন্যই রাজি হয়ে গেল?

বাবা বেশি রাজি, মা একটু কম।

বুকের মধ্যে ধক ধক করছিল হিমির। হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, এ মা, আমার বুকটা কেমন করছে যে! আমার গা ছুঁয়ে বল তো।

এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি। শুনেই ছুট্টে তোর কাছে এলাম।

ছলছলে চোখে চেয়ে হিমি বলল, কী হবে বল তো! আমাকেও কি গলায় দড়ি দিতে হবে?

ব্রহ্মদাদুটা না কী যেন। কোনও বুদ্ধি নেই।

মা-বাবা রাজি হয়ে গেল কেন বল তো? আমি কি গলার কাঁটা?

শুনে আমার যা মন খারাপ লাগছে, কী বলব। একটা মনের মতো জামাইবাবু হবে বলে কবে থেকে কত আশা করে বসে আছি, কোথা থেকে একটা বুড়ো জামাইবাবুকে জোগাড় করে আনল ব্রহ্মদাদু।

হিমি কথা বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। বাইরে অঘ্রানের দুপুর। তাদের নিবিড় গাছপালায় ছাওয়া বাগানের ফাঁক দিয়ে দূরে সবুজ খেত দেখা যাচ্ছে, তারপর তেপান্তরের মাঠ, দিগন্ত।

হিমি কী করে যেন জানে, সে খুব সামান্য মেয়ে নয়। না, তার কোনও প্রতিভা নেই তেমন। লেখাপড়ায় সে তেমন কিছু নয়। গান একটু-আধটু গাইতে পারে বটে, কিন্তু গানেও সে তেমন নম্বর পাবে না। বাকি থাকল ঘরকন্না। তা সে পারে। কিন্তু সেটা তার মা আরও ভাল পারে। তবে তার অসামান্যতা কোথায়?

এই প্রশ্নটারই জবাব সে স্পষ্ট করে দিতে পারবে না। শুধু জানে তার ভিতরে একটা কিছু আছে, একটা রহস্যময় গহীন কিছু যা সহজে ধরা যায় না, বোঝাও যায় না। শুধু আছে বলে টের পাওয়া যায়। হাঁস যেমন ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করার জন্য তা দেয়, সেও তেমনি খুব সংগোপনে নিজের ওই গহীন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা জিনিসটার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ওই তা দেওয়ার মতোই। কী সেটা তা জানে না।

রোজ যখন সে ঠাকুরের পটে ফুল জল বাতাসা দেয় তখন রোজ জিজ্ঞেস করে, আমার ভিতরে কী আছে গো ঠাকুর? বলে দাও না।

অসভ্য শেফালীটা শুনে বলেছিল, আর তা দিস না ভাই, শেষে বাচ্চা বিইয়ে বসবি।

মুখের কোনও আগল নেই ওর।

হিমি দেখন-সুন্দরী নয়। রাস্তায় ছিপছিপে মেয়েটি যখন হেঁটে চলে যায় তখন কেউ থমকে দাঁড়ায় না। চমকে ওঠে না। কিন্তু ভাল করে তাকালে বোঝা যায়, এই রোগাটে গড়নের মেয়েটার চোখে মুখে অসামান্য শ্রী আছে।

এই যে হিমি স্নানের পর চুল ছেড়ে বসে আছে, সেই চুল লুটিয়ে পড়ে আছে কত দূর পর্যন্ত। দাঁড়ালে হাঁটু ছাড়িয়ে নামে। তেমনি ঘেঁষ।

সবাই বলে, হাত পায়ের গড়নে লক্ষ্মীশ্রী আছে তার।

হিমি একটু ভাবের মানুষ। ভাবতে তার ভীষণ ভাল লাগে। আর বই পড়তে আর ভাবতে। সে বিয়ের মানে জানে, বর জানে, সংসার জানে। তার কল্পনায় তার বর আছে একজন। তাকে নিয়ে সে কত পুতুলখেলা খেলে। মনে মনে রোজ তাকে ভাঙে, গড়ে, ভেঙে ফের গড়ে।

কিন্তু এ কাকে ধরে নিয়ে এল ব্রহ্মদাদু?

তিন ভাইবোনের মধ্যে হৈমন্তী সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ঠাণ্ডা, এবং সবচেয়ে বাধ্য মেয়ে, মা-বাবার মুখের ওপর কখনও কথা কয়নি, তা বলে সে যে বকুনি কম খায় তা নয় কিন্তু। বরং অন্য দুই ভাইবোনের চেয়ে তার ওপরেই শাসনটা মায়ের একটু বেশিই, তার একটা বন্ধু আছে বকুল। সেও ভীষণ শান্ত মেয়ে, বকুল তাকে প্রায়ই বলে, তার মা অন্য সব ভাইবোনের চেয়ে তাকেই বেশি বকে। বোধহয় শান্ত হলে এরকমই হয়। সে কখনও মা-বাবার অবাধ্য হয় না, মুখে মুখে কথা বলে না। কিন্তু বয়স হলে মানুষের নিজেরও মতামত হয়। বলতে নেই, আজকাল হৈমন্তীরও হয়েছে। কখনও সখনও তার একটু আধটু প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারে না।

ছেলেমেয়েদের আগেই খাইয়ে দিয়েছে লবঙ্গ। এঁটোকাঁটা সেরে এখন রান্নাঘরের এককোণে একলাটি খেতে বসেছে সে। রোজ এরকমই একলাই খেতে হয় তাকে। এই সময়টায় কাছে কেউ থাকলে বেশ হত। কিন্তু কাউকে ডাকতে ইচ্ছে করে না। গরজ তো নেই কারও, মানুষটা একা খাচ্ছে দেখে এগিয়ে আসবে। সংসারে তার মতো মানুষের একটু অনাদর তো আছেই। অথচ তাকে না হলে কি চলে কারও? এক মুহূর্ত চলে না। আগে অভিমান হত, কেউ অভিমানের দাম দেয় না বলে এখন আর অভিমান হয় না। মেয়েদের আছে শুধু সব মেনে নেওয়া।

মা তাকে শিখিয়েছিল, বউমানুষদের নাকি পাঁচজনের সামনে বসে খেতে নেই। কেন শিখিয়েছিল কে জানে। যত নিয়ম তো বউদের বেলাতেই। লুকিয়ে খাওয়ার মধ্যে কোন সহবত আছে সে ভেবে পায় না। এই একলা খাওয়ার মধ্যে একটু গ্লানিও তো আছে। নিজের ওপর তাচ্ছিল্য বশে সে আর নতুন করে বাসন বাড়ায় না। থালাটালা নয়, বাটিতে ভাত নিয়ে বসে। ওর মধ্যেই ডালঝোল যা পারে মিশিয়ে নেয়। কোনওরকমে পেটটা ভরা নিয়ে হচ্ছে কথা। তবে কেউ যদি যত্ন করে বেড়ে দিত তাহলে বোধহয় দুটি খেতে পারত সে। দিনদিন যে খাওয়া কমে যাচ্ছে তা সে নিজেও টের পায়। আজ আরও অরুচি। সতীশকাকা যে বিয়ের প্রস্তাবটা এনেছে সেটাই কাঁটা কাঁটা হয়ে ঘুরছে মনের মধ্যে।

সতীশ ব্রহ্ম লোক খারাপ নয়। তাদের সঙ্গে সম্পর্কও বহুদিনের। এই গাঁয়ে সতীশকাকার কুড়ি বিঘের মতো জমি আছে। এটা সতীশকাকার শ্বশুরবাড়ির গাঁ, মরার আগে শ্বশুর জমিটা সতীশকাকার

বউয়ের নামে লিখে দিয়ে যায়। সেই শ্বশুর মরে ইস্তক শ্বশুরবাড়ির পাট উঠে গেছে। জমি দেখাশুনোর লোক ছিল না। চাষ-আবাদই বা কে করবে। বেদখল হওয়ার ভয়ও ছিল খুব। তখন সতীশকাকা এসে ধরেছিল মহেন্দ্রকে, তুই ডাকাবুকো লোক আছিস, আমার জমিটুকু রক্ষে কর বাবা, চাষবাস যা করিস কর, আমাকে কিছু দিস।

মহেন্দ্র ধর্মভীরু মানুষ। কখনও ঠকায় না কাউকে। সতীশকাকাকেও ঠকায়নি। প্রতি বছর দুবার চাষ করিয়ে ফসল বা ধানচাল বিক্রির টাকা আধাআধি বখরায় কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে সম্পর্কটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। এখন অনেকটা আত্মীয়ের মতই। সুতরাং সতীশকাকাকে বিশ্বাস করা যায়। হিমিকে জলে ফেলবে না।

সম্বন্ধ খারাপ কিছুও নয়। বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হোক মেয়ের এটা কোন মা-বাপ না চায়? মহেন্দ্র তো পারলে এক্ষুনি বিয়ে দেয়। কিন্তু লবঙ্গর ভাবনা অত সহজ পথে চলে না। আগের বউ ফাঁসি দিয়ে মরেছে, সেটা তো ভাবনার কথাই, অথচ প্রস্তাবটা ফেলতেও পারছে না।

শেষে কটা গরাস আর নামতে চাইছে না গলা দিয়ে। লবঙ্গ উঠে একটু তেঁতুল বাঁ হাতে বের করে নিল। জল ঢেলে তেঁতুল গোলা ভাত গিলতে লাগল কোনওক্রমে।

খুব শান্ত পায়ে হিমি এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়, চোখ তুলে লবঙ্গ বলল, একটু গুড় দে তো, সাদা বয়মটায় আছে।

গুড়ের ডেলাটা পাতে দিয়ে হিমি বলল, ব্রহ্মদাদু আজ কেন এসেছে মা?

ভ্রু কুঁচকে লবঙ্গ বলে, কেন আবার! উনি তো এ সময়ে আসেনই, ধানচালের হিসেব হচ্ছে দেখছিস না বাইরের ঘরে!

কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারছিল না হিমি। জিজ্ঞেস করলেই মা পাল্টা জানতে চাইবে, কার কাছে শুনলি? তখন সেবন্তীর নাম বলতে হয় আর তাহলে মা সেবন্তীর ওপর ভীষণ রেগে যাবে। আড়ি পেতে কথা শোনা মা খুব অপছন্দ করে।

লবঙ্গ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ নেমে এলি যে।

এমনিই।

রান্নাঘর থেকে টানা বারান্দা অন্য পাশে একটা শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঠেকেছে। বারান্দার নীচে উঠোন, গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেখানে গাছের চিকড়ি মিকড়ি ছায়ায় রোদ নড়ছে। এত সুন্দর দুপুরটা তার কাছে বড্ড বিবর্ণ। কেমন যেন! সংসার জিনিসটাই ভাল নয়। এত বন্ধন, এত শাসন, মাথার ওপরে এত লোক তার একটুও ভাল লাগে না আর।

ছোট্ট ঘটি তুলে ঢকঢক করে জল খেয়ে লবঙ্গ উঠে পড়ল। বলল, এসে ভালই করেছিস, এঁটো জায়গাটা মুছে নে তো।

মায়ের মুখে হাসি জিনিসটা বড় একটা দেখতে পায় না হিমি। সব

সময়েই মুখখানা রাগী-রাগী গম্ভীর। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের সামনে, না ভুল হল। ছেলের কাছে মা গম্ভীর নয়। শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মায়ের যত গাম্ভীর্য। বিশেষ করে হিমির সঙ্গে। দু বোনের ছোট হল ভাই। তার সবে দশ বছর বয়স, তার প্রতি খুব বেশি না হলেও মায়ের পক্ষপাত আছেই। মৃদুল নিজেও সেটা বোঝে।

হিমি এঁটো সেরে রান্নাঘরে শেকল তুলে দিল। মা আঁচাতে কুয়োপাড়ে গেছে। হিমি অলস পায়ে একবার বাইরের ঘরে উঁকি দিল। খাতা খুলে কি সব হিসেবনিকেশ দেখছে তার বাবা। ঝুঁকে খুব মন দিয়ে ব্রহ্মদাদু কি সব একটা সাদা কাগজে টুকে নিচ্ছে।

বাবা বলে, চাষবাসের অবস্থা ভাল নয়। চাষের খরচ বাড়ছে, ধানের দাম পড়ে যাচ্ছে। তা হবে। হিমি জানে, তারা মোটামুটি গরিব। খুব বেশি গরিব নয়। কিন্তু একটু গরিব, কথাটা তাদের তিন ভাইবোনকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আর এই জন্যই তাদের কোনও শখশৌখিনতাও নেই। হিমি কোনও সাজবার জিনিস কিনতে পারে না কখনও। চুলের ফিতে, কপালের টিপ আর পাউডার— এই হল তার আর সেবন্তীর সাজবার উপকরণ। আজকাল কত কী বেরিয়েছে, ফাউন্ডেশন, শ্যাম্পু, ভুরু আঁকার পেনসিল, লিপস্টিক। তার বন্ধুদের সকলের আছে। তাদের নেই, পাউডার, টিপ আর ফিতে দিয়ে আজকাল সাজে না কেউ তা বুঝবার লোকই নেই বাড়িতে। তার মাও সাজে না কখনও। একটাও বাহারি শাড়ি নেই, বিয়ের বেনারসিখানা ছাড়া।

ভারী নিরানন্দ লাগে আজকাল, শ্বশুরবাড়ি বড়লোক হলে তার কিন্তু খারাপ লাগবে না।

এই যে আজ একটু পোস্ত রান্না হল তার জন্যও কত পাঁয়তারা, কত পূর্ব প্রস্তুতি। কি না, পোস্ত হবে, এটা সবটাই হয়তো অভাব থেকে নয়, কৃপণতাও আছে বোধহয়।

বিনা কারণেই হঠাৎ বাইরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হিমি বলে উঠল, ব্রহ্মদাদু, ভাল আছেন?

ব্রহ্মদাদু মুখ তুলে তাকে দেখে এক গাল হাসল, তুই ভাল তো!

হ্যাঁ।

এবার খেয়ে দেয়ে একটু শরীরটা সারিয়ে ফেল। রোগা দেখছি কেন রে?

আমি তো রোগাই।

রোগা হবি কেন রে? এই তো বাড়ের বয়স।

মহেন্দ্র একটু ফুট কাটল, ওসব আপনি বুঝবেন না কাকা, রোগা হওয়াই আজকালকার রেওয়াজ। ওর মা তো খিটিমিটি করে একটু দুধ খাওয়ায়, খায় যেন বিষ গিলছে।

দুজনে ফের হিসেব নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। না, ব্রহ্মদাদুর

মুখ থেকেও কথাটা বের করা গেল না।

সেবন্তী যখন বলেছে তখন কথা একটা উঠেছে ঠিকই। তবে সেটা কত দূর গড়িয়েছে সেটাই জানা দরকার। সেবন্তী বলছিল, "বেঁটে বুড়ো, দোজবরে, আগের বউ ফাঁসি দিয়ে মরেছে।" সে তো ভীষণ ব্যাপার। তার মা বাবা কখনও এই বিয়েতে মত দিতে পারে? এতেই ভারী অবাক হচ্ছে হিমি। সে কি মা বাবার গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াল? না গলার কাঁটা? আদরের মেয়েই তো ছিল সে!

সারাটা দুপুর এলোমেলো পায়ে আনমনে, এলো চুলে সে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াল। বারান্দায়, উঠোনে, বাগানে, দোতলায়, ছাদে। বারবার মনটা নিবে যাচ্ছে যেন, অন্ধকারের মতো লাগছে চারদিক। একটু হাঁফ ধরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। লোকটা তার বউকে গলা টিপে মারেনি তো! মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে, এরকম তো কতই হয় বলে শুনেছে সে।

ব্রহ্মদাদুর ওপর মা বাবার অগাধ বিশ্বাস। তারও লোকটাকে খারাপ লাগে না। হাসিখুশি, বেশ লোক। বাবার সঙ্গে তার একটা লেনদেন আছে। কখনও তা নিয়ে গণ্ডগোল হয়নি।

দুপুরে সবাই ঘুমোল একটু, ব্রহ্মদাদু বাইরের ঘরে, বাবা মেঝেয় মাদুর পেতে, মা আর সেবন্তী দোতলায় শোওয়ার ঘরে, ভাই খেলতে গেছে ইস্কুলের মাঠে। সে একা, বড্ড একা।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে পেয়ারা গাছে চুপটি করে বসে-থাকা একটা শালিখ পাখিকে দেখছিল। দেখার কিছু নয়, তবু চেয়ে ছিল মাত্র। ঘর থেকে মা ডেকে বলল, এদিকে আয় তো, চুলটা একটু বেঁধে দিই।

এটাই হল তার মায়ের আদর। এমনিতে মা কখনও আদর টাদর করে না তাকে। এই চুল বেঁধে দেওয়াটাই মার চূড়ান্ত আদর বলে ধরে নিয়েছে হিমি।

তার চুল অনেক, অঢেল। এত চুল যে সামলানো যায় না।

মা চুল মোটা চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, ভাল করে তেল দিস না কেন। চুল ম্যাটম্যাট করছে।

সর্ষের তেল দিতে ইচ্ছে করে না।

ওমা! সে আবার কী কথা? সর্ষের তেলই তো ভাল, চুল কালো হয়, চকচকে থাকে। নারকোল তেলে যা ভেজাল।

ইস্কুলের বন্ধুরা চুলে সর্ষের তেল দিই বলে খ্যাপায়। সেদিন তো নন্দিনী আমার পাশে বসতেই চাইল না চুল থেকে সর্ষের তেলের গন্ধ পাচ্ছিল বলে।

না বসুক পাশে, তোর মতো চুল আছে ওদের কারও? ছাইভস্ম সব গন্ধতেল মেখে চুলগুলো নষ্ট করছে। সবচেয়ে ভাল ক্ষার দিয়ে চুল পরিষ্কার করা আর ঘষে ঘষে সর্ষের তেল লাগানো। শ্যাম্পুও কি আর

ভাল জিনিস? ও তো গোলা সাবান, একটু গন্ধ মিশিয়ে গুচ্ছের দাম নেয়।

হিমি কথা বাড়াল না। তাতে লাভ নেই। কোন জায়গায় থামতে হয় তা সে জানে। এ যুগের একটি যুবতী মেয়ে চুলে সর্ষের তেল মাখে, এ কথাটা লোকে বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু বলতে নেই, সর্ষের তেলে তার চুলের তো ক্ষতি হয়নি। মাও চিরকাল সর্ষের তেল মেখেছে। মায়েরও দিব্যি এক ঢল চুল।

মা চুল টেনে গোছা করে গোড়ায় ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, বড়লোকের ঘরে যদি পড়িস তখন ইচ্ছেমতো ওসব মাখিস। গরিব বাপের বাড়িতে যে সব সাধ মেটেনি সব মিটিয়ে নিস।

বাঃ রে। ওরকম ভাবে বলছ কেন? আমি কি কখনও কিছু চেয়েছি?

তা চাও না। কিন্তু মনে মনে তো ইচ্ছে হতে পারে। এই যে সর্ষের তেলের কথা বললি।

বন্ধুরা বলে তাই বললাম।

বন্ধুরাই তো নষ্টের গোড়া। ওরাই তো মাথায় পোকা ঢোকায়।

সবাই বলে না, কিন্তু কেউ কেউ বলে, গোসাঁইবাড়ির পিউ তো আমার দেখাদেখি আজকাল সর্ষের তেল ধরেছে।

তাই! ওই হচ্ছে বুদ্ধিমতী মেয়ে। যারা স্রোতে ভেসে চলে তারা বোকা।

লক্ষ্মী মেয়ের মতোই শুনছিল হিমি। মায়ের কথার মধ্যে সবসময়ে একটা জোর থাকে। যা বোঝে ঠিক সেইভাবেই চলে, কারও কথায় মা টলে না। সেই জন্য বাবা অবধি মাকে খুব সমীহ করে। পাড়া প্রতিবেশীরা সমস্যায় পড়লে অনেক সময়ে এসে মার কাছে পরামর্শ নিয়ে যায়। সবাই বলে, লবঙ্গ খুব বুদ্ধিমতী।

না, মায়ের মতো নেই হিমির। সে একটু আনমনা আছে, একটু ভাবুকও বোধহয়।

বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে মা বলল, বিয়ে হয়ে গেলে তো আর শাসন করতে যাব না। তখন নিজের মতো করে চলিস।

আজ বার বার বিয়ের কথা বলছ কেন মা?

এমনি। বিয়ের বয়স তো হল, নাকি?

আজকাল আঠারোর নীচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বেআইনি।

জানি মা। আঠারো হতে আর কতই বা বাকি। বিয়ের কথা চালাচালি হতে হতেই বয়স হয়ে পড়বে।

কথা চালাচালি শুরু হয়েছে নাকি?

মা স্নিগ্ধ গলায় বলল, সুলক্ষণা মেয়েদের নিয়ে তো কথা হবেই।

তোমাকে কেউ বুঝি কিছু বলেছে?

না বলবে কেন? আমার মেয়ে কি ফ্যালনা?

আজ কী হচ্ছে কে জানে। মা এত গদগদ হয়ে তো কখনও কথা বলে না তার সঙ্গে।

সত্যি কথা বলবে? কে তোমাকে কী বলেছে?

ও বাবা! এ যে জেরা করে রে!

কাঁদো কাঁদো হয়ে হিমি বলে, জেরা করা হল বুঝি? ওসব শুনে আমার মন খারাপ লাগছে না!

মা তার মাথায় একটা আদরের ঠোসা দিয়ে বলল, মন খারাপের কী! যার ঘরে যাবি আলো করে দিবি, তবে না!

আমি কারও ঘরে যাব না।

যাবি না! তাই কি হয়? বাপের বাড়িটা তো মেয়েদের জায়গাই নয়।

কে কী বলেছে বলো।

অস্থির হচ্ছিস কেন? সতীশকাকা কথায় কথায় একটা পাত্রের খবর দিল। বেশ বড়লোক, দাবিদাওয়া নেই, গাড়ি বাড়ি আছে। এখনও কথা কিছু এগোয়নি মা। সবে প্রস্তাবটা এসেছে। যদি কপালে থাকে তো হবে।

এঃ মাঃ। এখনই বিয়ে কী গো?

অল্পবয়সে বিয়ে হলে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক খুব মজবুত হয়। দু'জনে বোঝাপড়াও হয় ভাল। আমার বিয়ে হয়েছিল যখন পনেরোও পোরেনি।

তোমাদের আমল কি আছে?

আমল বলে কথা নেই। যা ভাল তা সবসময়েই ভাল। যত ধিঙ্গি বয়সে বিয়ে করবি তত শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হবে। এখন যা তো, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তোকে কি আমরা জলে ফেলব?

হিমি বুঝল, ষড়যন্ত্রটা পাকিয়ে উঠছে। তার কান্না পাচ্ছিল।

ষড়যন্ত্রটা আরও পাকিয়ে উঠল দু'দিন বাদে। মহেন্দ্র সদরে গিয়েছিল, সন্ধের মুখে ফিরে এসে ভারী খুশির গলায় বলল, ওঃ, যা দেখে এলাম মাথা ঘুরে যায়।

লবঙ্গ অবাক হয়ে বলল, কী এমন দেখে এলে?

অতি চমৎকার ঘর। পাত্রটিও খাসা।

সতীশকাকা যে বলল বেঁটে।

দূর দূর, সতীশখুড়োর চোখে চালসে হয়েছে। খুব ঢ্যাঙা লম্বা নয় বটে, কিন্তু বেঁটে বলা যায় না। চোখমুখ চমৎকার। ব্যবহার ভীষণ ভাল।

কথাটথা কইল বুঝি তোমার সঙ্গে?

তা কইবে না! কত কথা হল। আস্তে আস্তে কথা বলে, ঠাণ্ডা মাথা। ওপর-চালাকি ভাব নেই। অহংকার নেই। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম অবধি করেছে। সতীশকাকাকে খুব মানে দেখলাম। অ্যাটম বোমার মতো বড় বড় সাইজের চারটে কমলাভোগ, রাক্ষুসে সিঙ্গারা, ভিতরে কাজু কিসমিস অবধি দেওয়া, দু'খানা। তার ওপর মুক্তিপদর দোকানের

বিখ্যাত সরের নাড়ু —ওঃ কী খাওয়াই খাইয়েছে! ঘন দুধের চা।

এখন খাওয়ার গল্প রেখে আসল কথাটা বলো।

খাওয়াটাও দেখতে হয়, বুঝলে! সেটাও ফেলনা জিনিস নয়। ওই দেখেও বোঝা যায় হাতটা দরাজ কিনা, মনটা উদার কিনা, রুচি আছে কিনা।

সেটা তো দেখলে। আগের বউয়ের কথা কিছু বলল-টলল?

সব বলেছে। কিছু লুকোয়নি। এমন কী শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলেছে, সেখানেও খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, তারাও অস্বীকার করবে না। তবে পাড়ায় দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে দেখলুম সতীশকাকার কথা একবর্ণ অতিরঞ্জিত নয়। সবাই একবাক্যে বলল, ওরকম ছেলে হয় না। বউটারই গোলমাল ছিল।

হিমির ছবি দেখাওনি?

সেইটেই তো সবার শেষে বলব বলে রেখেছি। ছবি দেখে সবাই একবাক্যে বলেছে, ভীষণ সুন্দর মেয়ে। তাদের হাতে আরও পাত্রী আছে বটে, কিন্তু হিমির মতো কেউ নাকি নয়। মত প্রায় আদায় করেই এনেছি। পরশু রোববার তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

ও বাবা! এত তাড়াতাড়ি!

তাদের তাড়া আছে। ছেলের মা বলল, আমরা আগের কলঙ্কটা মুছে ফেলার জন্যই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাই। ছেলে রাজি হচ্ছে না বটে, কিন্তু ভাল মেয়ে পেলে আপত্তি করবে না। তারা শহুরে শিক্ষিত আর চাইছে না। গাঁ-গঞ্জের লক্ষ্মী মেয়ে খুঁজছে। সেদিক দিয়ে হিমিই এগিয়ে আছে। চোখে দেখলে আরও কাত হয়ে পড়বে।

দাবি-দাওয়ার কথা কিছু বলল?

আরে না না। সেসব কথা ভাল করে তুলতেই দিল না। ছেলের বাপ বলল, শাঁখা সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিলেই হবে। আমার ছেলেদের টাকার অভাব নেই। তা শুনেও এলুম, বছরে নাকি দশ বারো লাখ টাকা আয়।

লবঙ্গ চোখ বড় বড় করে বলল, বল কী গো!

মহেন্দ্র হেঃ হেঃ করে হেসে বলল, এ একেবারে রাজার ঘর। বুঝলে!

তা বুঝল লবঙ্গ। মনের খিঁচটাও আর রইল না। মহেন্দ্রর আবেগ উচ্ছ্বাস একটু বেশি বটে, কিন্তু পাত্র যে ফেলনা হচ্ছে না সেটা তো বোঝা যাচ্ছে!

শুধু হিমিই সেটা বুঝতে চাইছে না। মায়ের কাছে রাতে সে সব শুনল। চুপ করেই শুনল। কিন্তু মুখখানা ভার হয়ে রইল তার। সে তো এত সুখ চায়নি! তার তো এত প্রাচুর্যের দরকার ছিল না! কী দরকার ছিল তা অবশ্য বুঝতে পারে না হিমি। তার শুধু মনে হচ্ছে এটা একটা বাড়াবাড়ি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

ঘুমোনোর আগে মা শুধু বলল, এখন ঠাকুর-ঠাকুর করে পছন্দ করে গেলেই হয়।

হিমি জানে, কেমন করে যেন জানে, এরা তাকে পছন্দ করবে, করবেই। আর সেই ভেবেই তার বুক কাঁপছে। তার ভাল লাগছে না। পাত্রকে সে দেখেনি। কিন্তু মনটা সায় দিচ্ছে না।

তার ভিতরে একটা কিছু আছে। সেই একটা কিছুকে আজ তার বড্ড দরকার। সেটা যে কী তা সে বুঝতে পারে না, কিন্তু টের পায়।

আজ ঘুম আসছিল না। সে বাঁদিকে কাত হয়ে শুয়ে গরম উদভ্রান্ত মাথায় ঠাকুরকে বলল, ঠাকুর, এবার একটা কিছু করো। আমি এ বিয়েটা চাই না। একটুও চাই না। শিবরাত্রিতে উপোস করেছি, মনে নেই তোমার? দাঁতে কুটোগাছি কাটিনি, ঢোঁক অবধি গিলিনি। এই কি তার প্রতিফল হচ্ছে?

যদি ভালই হয়?

না না ঠাকুর। ভাল হবে না। আমার মন বলছে যে!

চার

সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ কিছুই একবগ্গা নয়। জীবনের কাহিনীটা নানা ছাঁদের অক্ষরে লেখা। কোথাও বড় হরফ, কোথাও ছোট হরফ, কোথাও অস্পষ্টতা। রত্নার যেমন। মাঝে মাঝে সে ভাবে, আরও একটু ভাল বিয়ে কি হতে পারত তার? পারত। নিশ্চয়ই পারত। তার চেহারা সুন্দর। বাড়ির অবস্থা ভাল। পাঁচ বছর আগে যখন এক প্রিন্টিং প্রেসের মালিকের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ আনল গিরীশ ঘটক তখন সে ইচ্ছে করলে আপত্তি করতে পারত। কিন্তু ভেবেছে, কী হবে? অজানা, অচেনা একটা লোকের সঙ্গেই তো শেষ অবধি আমার বিয়ে হবে, প্রিন্টিং প্রেসই বা খারাপ কি? তখন নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় পাওয়ার জন্য একটা ব্যগ্রতা ছিল। বিয়ে সেই প্রার্থিত আশ্রয়।

শুনেছিল ছেলের গায়ের রং কালো। বরাবর কালো মানুষ তার অপছন্দ। তবু ভাবল, রং ধুয়ে কি আর জল খাব!

কাকা জ্যাঠারা ঘটা করেই বিয়ে দিয়েছিল তার। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যখন আলাপ-সালাপ হল তখন দেখল, লোকটা তেমন ঘোরপ্যাঁচের নয়। সোজা সরল আছে, রত্নার বয়স তখন আঠেরো আর উনিশের মাঝামাঝি, প্রিয়কুমারের ছাব্বিশ সাতাশ।

পরিবারে কলঙ্ক থাকলে শ্বশুরবাড়িতে এসে মেয়েদের কিছু অসুবিধে এবং লজ্জায় পড়তে হয়। ভয়টা রত্নার ছিলই। আর সেই জন্য

প্রথম থেকেই সে বুদ্ধি খাটাতে শুরু করে। যে-কোনও প্রসঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে তার মায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে খোঁচা দেওয়া হতে পারে বলে সে পারতপক্ষে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা দেখলেই নিজেকে সংবরণ করে নিত। প্রয়োজন ছিল প্রিয়কুমারকে সম্পূর্ণভাবে তার পক্ষে নিয়ে আসার। বুদ্ধিমতী রত্না প্রিয়কুমারকেই আগে ভাগে বুঝে নিল। সরল মানুষেরা কখনও কখনও গোঁয়ার হয়। প্রিয়কুমারও তাই। সে একটু মারকুট্টা ধরনের। রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে সে চট করে মাথা গরম করে ফেলে এবং হাত-টাত চালিয়ে দেয়। খিদে পেলে সে একদম খিদে সহ্য করতে পারে না। দেহ মিলনের সময় সে স্ত্রীর ওপর প্রভুত্ব করতে ভালবাসে। তার যে যৌন ক্ষমতা প্রবল এবং যে কোনও মেয়েকে সন্তুষ্ট করতে পারে এইটেই তার মস্ত বড়াই। রত্না খুব সহজেই এই ব্যাপারগুলিকে বুঝে লোকটাকে পোষ মানিয়ে ফেলল। শাশুড়ি দজ্জাল না হলেও বেশ ঠোঁটকাটা, এক বিবাহিতা ননদ মাঝে মাঝে এসে নানারকম টিটকিরি দেওয়ার চেষ্টা করত। শ্বশুর অত্যধিক বিষয়ী, হিসেবি এবং অপচয় পছন্দ করে না। রত্নার পক্ষে এসব সামাল দেওয়া শক্ত হল না। এক বছরের মধ্যে হাওয়া ঘুরে গেল।

এ বাড়িতে তার মায়ের কথা যে ওঠেনি তা নয়। বেশ কয়েকবার উঠেছে। চুপচাপ সয়ে গিয়েছে রত্না। একদিন শাশুড়ি তাকে ভাল মনেই বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার মা চলে গেল কেন বলো তো বউমা।

রত্না ভেঙে বলেনি। শুধু বলল, আমি তখন ছোট ছিলাম। অত বুঝতে পারতাম না।

মায়ের পক্ষ নিয়ে তার তো বলার কিছু নেই। যে সময়ে মনোজকুমারের সঙ্গে তার মায়ের প্রেমের খেলা চলছে সেই সময়ে সে মায়ের মুখে একটা অদ্ভুত আনন্দের দীপ্তি দেখতে পেত। এমন বেহেড হয়ে গিয়েছিল মা যে, রত্নার কাছে অবধি কয়েকদিন বলেছে, মনোজটা কী দুষ্টু জানিস? আমাকে বলে কিনা —কথাটা শেষ হত না প্রায়ই। আর একদিন বলেছিল, কীভাবে যে তাকায়, গা শিউরে ওঠে! তখন তার এগারো বছর বয়স। একেবারেই কি বুঝত না? হয়তো অশনি সংকেতটা ধরতে পারেনি। কিন্তু কিছু একটা বুঝতেও পারত। তার ভাল লাগত না। মায়ের মুখের মুগ্ধ হাসি, আনমনা ভাব, সম্মোহিত চোখ দেখে তার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করত ভয়। খেলাটা চলেছিল বোধহয় মাত্র দিন দশেক। মাত্র দশ দিনেই একজন বউমানুষকে সংসার সন্তানের ভূমি থেকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে চলে গেল ধূমকেতুর মতো অজ্ঞাত কুলশীল একটা লোক। ভাবলে রত্নার আজও অবাক লাগে।

পাঁচ বছর অনেক সময়। রত্না আজ বেশ একজন তৃপ্ত মহিলা। সে এখন এই সংসারের অবিসংবাদী কর্ত্রী। প্রিন্টিং প্রেস থেকে আয় ভালই

হয়। শহরে তাদের দোতলা বাড়ি।

সুখী জীবনের একটা অসুবিধেও আছে। জীবনটা একটু নিস্তরঙ্গ। তার একটাই মেয়ে। বয়স তিন। শাশুড়ি একটা ছেলের কথা বলছেন প্রায়ই। রত্না ঠিক করে রেখেছে, মেয়ে পাঁচ পেরোলে ফের গর্ভবতী হবে ছেলের জন্য। ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে অবশ্য ফের কয়েক বছর পর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েকে তার মানুষ করতে হয় না, শাশুড়ি তাকে দখল করে আছেন। এ বাড়িতে কাজের লোকও অনেক। কাজেই রত্নার সময় কাটতে চায় না। মাঝে মাঝে প্রেসে গিয়ে হানা দিয়ে সে অনেক কিছু বুঝতে শিখে গেছে। একটা সমিতিতে ভর্তি হয়ে সমাজসেবার কাজকর্মও কিছু করে। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। সে যা খুশি করতে পারে।

বছর খানেক আগে এই তরঙ্গহীন জীবনে একটা ঘটনা ঘটল। তাদের পাশের বাড়ির বিমান বিয়ে করে বউ আনল। ধুমধামের বিয়ে। তারা নেমন্তন্ন খেয়ে এল। বেশ চালাক চতুর চটপটে মেয়েটি। গাঁ-গঞ্জের মেয়ে বলে মনেই হয় না। তার সঙ্গে কয়েকদিনে বেশ ভাবও হয়ে গেল রত্নার। মুখটা একটু গোঁজ করে থাকত। বিষণ্ণ ভাব। আড়ালে যে কাঁদত সেটা বুঝতে অসুবিধে হত না।

মেয়েটা একদিন তার কাছে এসে বলেছিল, দেখো রত্নাদি, তোমার কাছে বলতে ইচ্ছে করছে। আমাকে কিন্তু আমার বাবা মা জোর করে এখানে বিয়ে দিয়েছে।

অবাক রত্না বলল, তাই? কিন্তু কেন?

সে অনেক কথা। আমি একটা ছেলেকে ভালবাসতাম। এখনও বাসি। তাকে মা বাবার পছন্দ নয়। সে বেকার, মাউথঅর্গান বাজিয়ে বেড়ায় এই তার দোষ। এ দেশের কটা ছেলে রোজগেরে বলো তো দেখি!

রত্না মধুরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, এখন ওটা যে ভুলতে হবে। যা পেয়েছ তা নিয়েই খুশি থাকতে হবে যে!

মধুরা মাথা নেড়ে বলল, তা কি জানি না! চেষ্টা তো করছি। পারছি না। আমার বর কেমন লোক বলো তো!

ও মা! সে তো ভীষণ ভাল ছেলে! কেউ কখনও বিমানকে খারাপ বলে না তো!

তুমি জানো না। বাইরে থেকে যতটা ভাল মনে হয়, তা কিন্তু নয়।

কেন বলো তো! কী করেছে বিমান?

রাতে ঘরের মধ্যে আমাকে পোশাক ছেড়ে একদম উদোম হয়ে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে বলে। নাচতে বলে।

রত্না হেসে ফেলল, তাই বুঝি! হয়তো মেয়েমানুষের সংস্পর্শে আসেনি বলে ওরকম দেখতে চায়। তা বরের কাছে লজ্জার কী?

লজ্জা হত না যদি তার পরে একটা শরীরের সম্পর্ক হত।

হয় না?

না। ওর শুধু দেখে আনন্দ। ঘেঁটে আনন্দ। তার বেশি কিছু নয়।

রত্না চিন্তিত হয়ে বলে, তাহলে তো প্রবলেম। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও না কেন?

সে কথা বলায় ভীষণ রেগে গেল। আমাকে রোজ রাতে ওরকম উদোম হয়ে ওর সামনে ঘুরতে হয় এই শীতের রাতে। দেড় মাসের বেশি হয়ে গেল।

ভারী অদ্ভুত তো!

ক্যাসেটে মিউজিক চালিয়ে নাচতে বলে। আমি তো নাচতে পারি না। অথচ ও ছাড়ে না।

এসব তো আমি জানতাম না ভাই। পুরুষমানুষদের একটু-আধটু বায়নাক্কা থাকেই। বউকে নানাভাবে ভোগ করতে চায়। কিন্তু এ তো দেখছি জটিল ব্যাপার। ডাক্তার দেখানো দরকার। জোর করে নিয়ে যাও।

কীভাবে জোর করা যায় বলো তো! ও তো নিজের ব্যাপারটাকে অসুখ বলে মনে করছে না।

তাহলে কী হবে?

বরের আদর ভালবাসা পেলে আমি হয়তো অতীতের ঘটনাটা ভুলে যেতে পারতাম। চেষ্টাও করছিলাম। কিন্তু তা তো হল না।

তোমাকে ভালবাসে তো!

সেটা কী করে বোঝা যাবে বলো! নতুন বিয়ে হয়েছে, পুরুষের আমি তেমন কিছুই তো জানি না। প্রথমটায় ভেবেছিলাম এটাই বোধহয় রেওয়াজ। এখন বুঝতে পারছি তা নয়।

নয়ই তো। তাহলে বিয়ে করা তো ওর ঠিক হয়নি। এরকম ঘটনা আমি জন্মে শুনিনি বাবা। তবু তুমি একটু মানিয়ে নাও। সুযোগ সুবিধেমতো ভাবটাব করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। এখানে দরকার নেই। লোকাল ডাক্তার দেখালে জানাজানি হতে পারে। কলকাতায় নিয়ে গেলেই ভাল।

মাথা নেড়ে মধুরা বলল, ও যাবে না। বললেই ভীষণ রেগে যাচ্ছে। চোখমুখে তখন খুনির ভাব ফুটে ওঠে। আমি ভয় পাই!

ও মা! এদিকে তো কত শান্ত, ভদ্র, ঠাণ্ডা গলায় কথা বলে। আজ থেকে তো দেখছি না ওকে!

এই ঘটনার কয়েকদিন বাদেই দুপুরের দিকে একটা ছেলেকে ধরে ফেলল পাড়ার লোক। সে নাকি বিমানদের বাড়িতে পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। পাড়ার লোক হইচই বাঁধাল, মারধরও করা হল। ছেলেটা অবশ্য মধুরার নামটাও বলেনি। মধুরাই খবর পেয়ে

দোতলা থেকে নেমে এসে নিজের বাপের বাড়ির লোক বলে পরিচয় দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচায়। আর সেটা নিয়েই জলঘোলা হল বিস্তর। সবাই একরকম জেনে গেল যে ছোকরা মধুরার পূর্বপ্রেমিক। দিনে-দুপুরে ছেলেটা কেন বোকার মতো ওদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করল সেটা ভেবেই পাচ্ছিল না রত্না। দু'দিন বাদে ওদের বাড়িতে গিয়ে মধুরার কাছে শুনল, ছেলেটা মধুরাকে না পেয়ে কেমন পাগল-পাগল হয়ে গেছে।

তোমার বর জানতে পেরেছে কিছু?

হ্যাঁ। খুব অশান্তি হচ্ছে। খবর পেয়ে আমার বাবাও এসেছিল কাল। এই দেখো এমন থাপ্পড় মেরেছে যে আমার বাঁ চোয়ালটা এখনও ফুলে আছে।

একদিন ভরদুপুরে মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল। বোকা মেয়ে। রত্নাকে বললে সে ওকে বলত, বরং তোমার পল্টুর সঙ্গেই পালিয়ে যাও। আদালতে গিয়ে ডিভোর্স নাও। করাই যেত ওসব। বাঁচার পথ কি ছিল না। বাঁচার পথ চারদিকেই তো খোলা। মরল ভয়ে, নৈরাশ্যে, ঘাবড়ে গিয়ে।

সাত আট মাস পার হয়ে গেছে। মধুরার গোপন দুঃখ আর লড়াইয়ের কথা হয়তো রত্না ছাড়া আর কেউ জানে না।

গতকাল বিমানের মা এসেছিল তার শাশুড়ির কাছে। খুব আহ্লাদের সঙ্গেই বলল, বিমানের জন্য একটা ভাল মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। গোপালগঞ্জে বাড়ি। রোববার তারা মেয়ে দেখতে যাচ্ছে।

শুনে রত্নার গা চিড়বিড় করছিল। বিমান কোন আক্কেলে বিয়ে করতে চাইছে? আবার রাত্রিবেলা বউকে ল্যাংটা করে দৃশ্য দেখবে বলে? ফের একটা মেয়ের সর্বনাশ? এভাবেও হয়তো কোনও কোনও পুরুষের কামসিদ্ধ হয়। তা বলে একটা সরল সোজা মেয়েকে নিয়ে পুতুলখেলা কেন?

কালকেই রত্না ঠিক করে রেখেছিল, বিয়েটা সে আটকাবে। তবে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে নয়। হইচই বাঁধিয়েও নয়। তাতে লাভ হবে না। বিমানকে সবাই একজন স্বাভাবিক, ভদ্র ছেলে বলে লোকে জানে, কাজেই বিশ্বাস করবে না।

কী করে বিয়েটা আটকাবে সেটা নিয়েই কাল থেকে ভাবছে রত্না। বেনামা চিঠি দেওয়াটা কি শোভন হবে? তার রুচিতে বাঁধছে। আর হাতের লেখা একটা মস্ত দলিল। ধরা পড়লে ভারী লজ্জার ব্যাপার হবে। প্রিয়কুমারকে বললে সে বিশ্বাস করবে ঠিকই। সে রত্নাকে আদ্যন্ত বিশ্বাস করে। কিন্তু সে মাথাগরম মানুষ। হয়তো হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসবে।

আরও একটা কথা বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। মধুরাই যে সত্যি কথা বলেছে তার ঠিক কী? তার আগের প্রেমিক ছিল।

হয়তো বিমানের ওপর রাগে আক্রোশে বানিয়েও বলে থাকতে পারে।

সুতরাং একটা দোলাচলের মধ্যে রয়ে গেল রত্না। কিছু স্থির করতে পারল না।

সবচেয়ে ভাল হত যদি বিমানকেই জিজ্ঞেস করা যেত। তার বিয়ের সময় বিমান আর তার ভাই ধীমান বরযাত্রী গিয়েছিল। তাকে গাল ভরে বউদি ডাকে, হাসিঠাট্টাও হয়। গত পাঁচ বছর ধরে একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাদের প্রেসে বিমানদের ব্যবসার বিলবই, রসিদ, ইনভয়েস, চালান এবং আরও অনেক কিছু ছাপা হয়। মাসে দশ বারো হাজার টাকার কাজ। মধুরার সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু? মাত্র দুই আড়াই মাস। তার ওপর মেয়েটা তো মরেই গেছে। সুতরাং এই জটিল এবং সন্দেহজনক ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াঘাঁটা দিতে গেলে কি বিমানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে না? বিমানকে জিজ্ঞেস করলে তার পৌরুষে লাগবে, অহং আহত হবে। আর এসব কি জিজ্ঞেস করা যায় একজন পর-পুরুষকে?

কাল থেকে ভাবছে রত্না। ভেবে ভেবে আজ দুপুরে সিদ্ধান্ত নিল, সে কিছুই করবে না, যা হওয়ার হোক। পৃথিবীতে কত ঘটনাই তো ঘটে, সে কি পারে সব কিছুর বিহিত করতে?

দুপুরে হঠাৎ বিমানের মা সোজা তার ঘরে এসে হাজির।

ও রত্না, তোমাকে একটা কথা বলতে এলুম।

বলুন মাসিমা।

সামনের রোববার আমরা বিমানের জন্য মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। তা আমাদের সকলের ইচ্ছে, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

রত্না অবাক হয়ে বলে, আমি। আমি কেন? আপনারা বাড়ির লোক যাচ্ছেন সেই তো ভাল।

সেটাই তো কথা মা। আমরা বাড়ির লোক, আপনজন, আমাদের দেখায় ভুল হতে পারে। একজন বাইরের লোক থাকলে সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করতে পারবে। তুমি তো ভীষণ বুদ্ধিমতী। বিমানেরও খুব ইচ্ছে তুমি যাও। গোপালগঞ্জ বেশি দূরের রাস্তাও নয়। গাড়ি করে যাব, আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হয়তো লাগবে। তোমার শাশুড়িকে বলে রেখেছি, উনি মত দিয়েছেন।

রত্নার বুক থেকে একটা বদ্ধ বাতাস শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মেঘ না চাইতেই জল। হয়তো একটা উপায় হবে। কে জানে।

ঠিক আছে মাসিমা, যাব।

বাঁচালে মা। ওই মেয়েটা কেলেঙ্কারি করে মরে যাওয়ার পর সংসারটা যেন আমার বুকে পাথর হয়ে চেপে বসেছে। বিমানের মুখের দিকে তো চাইতেই পারি না। নতুন যদি একটা লক্ষ্মী বউ ঘরে আসে তাহলে বোধহয় বাড়ি থেকে অমঙ্গলের ভাবটা দূর হবে। ওই ফাঁসির

ঘরে বিমান তো একাই শোয়। আমি ভয় পাই মা, কি জানি আত্মাটা এসে যদি গলাটলা টিপে ধরে।

রোববারের দেরি নেই। কাল বাদে পরশু। বিমানের মা চলে যাওয়ার পর শাড়ি বাছতে বসল রত্না। শাড়ি তার অনেক। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসার সময় জ্যাঠাইমা জোর করে তার মায়ের সব শাড়ি বাক্স ভর্তি করে সঙ্গে দিয়ে দিল। বলল, এগুলো পড়ে থেকে নষ্ট হবে। নিয়ে যা। নিয়ে এসেছে বটে রত্না, তবে পরেনি। বড্ড অশুচি লাগত পরতে।

আজ কী মনে হল, ফাইবারের দামি মস্ত স্যুটকেসটা খুলে বসল সে। খুলতেই চৌদ্দ বছরের পুরোনো একটা বদ্ধ বাতাস বেরিয়ে এসে তার নাকে ধাক্কা দিল। সেই বাতাসে ম ম করছে মায়ের গন্ধ। কখনও মায়ের শাড়ি পরতে ইচ্ছে হয়নি তার। কেমন যেন ঘেন্না করত, রাগ হত। এখন তা হল না। চৌদ্দ বছরের পুরনো মায়ের গন্ধটা পেয়ে সে কেমন অভিভূত হয়ে বসে রইল। বয়স হচ্ছে তো, তাই বোধহয় তার মনটাও ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে।

আজ বাক্সটার সামনে বসে মায়ের কথাই ভাবতে লাগল সে। মা বেঁচে আছে তো। নাকি লোকটা কিছুদিন ফুর্তি করে গলা টিপে মেরে কোনও নদী বা ডোবায় ফেলে দিয়েছে? বিচিত্র নয়। কারণ তখন লোকটার গ্রামেও গিয়েছিল পুলিশ। মনোজকুমারের আসল নাম ছিল মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি। তার বাড়ির লোক বলে দিয়েছে, মনোরঞ্জন বহুকাল বাড়িছাড়া, ত্যাজ্যপুত্র, তার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। দু'জন যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে। মনোজকুমারের চেহারাটা আজও মনে আছে রত্নার। বেশ লম্বা চওড়া, ফর্সা, হিরোর মতো দেখতে। গানের গলাও ছিল ভাল। দু-চারটে সিনেমাতেও নাকি খুচখাচ পার্ট করেছিল। কিন্তু মাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর লোকটা সিনেমা বা থিয়েটার বা যাত্রাদলেও নাম-টাম করেনি। একদম উবেই গেল দুইজনে। কে জানে হয়তো দু'জনে গোপনে কোথাও সংসার পেতে বসেছে। বাচ্চা-কাচ্চাও হয়ে থাকবে।

পালিয়ে যাওয়ার পর মা ফিরে আসবে বলে কিছুদিন আশায় আশায় ছিল তারা দুই ভাইবোন। রতনের তো বিশ্বাস ছিল, তাকে মা যা ভালবাসে তাতে বেশিদিন ছেলেকে ছেড়ে থাকতেই পারবে না। কিন্তু বড় হতে হতে তারা বুঝেছে, ফিরে এলেও লাভ ছিল না। তাদের রক্ষণশীল পরিবার গ্রহণ করত না মাকে। পণ্ডিতদের ডেকে নানারকম বিধানও শোনা হয়েছিল। এক পণ্ডিত বিধান দিয়েছিলেন, কুলত্যাগিনী নারী ফিরে এলে তাকে সারা জীবন মুণ্ডিত মস্তকে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। কাশীর এক পণ্ডিতকে একবার ধরে এনেছিল জ্যাঠামশাই। ফর্সা টুকটুকে চেহারা। ভারী অমায়িক মানুষ।

তার নাম রমেশ আচার্য। রমেশ আচার্য কিন্তু বলেছিল, কোনও নারী যদি কুলটা, দুশ্চরিত্রা, গৃহত্যাগিনী হয় এবং সে ফিরে এসে সমবেত লোকজনের সামনে যদি নিজমুখে বলে যে সে পবিত্রা এবং নিষ্কলঙ্ক তাহলে শাস্ত্রের বিধান হল তার মুখের কথাই সবাইকে মেনে নিতে হবে এবং তাকে সসম্মানে ঘরে ঠাঁই দিতে হবে।

এসব বিধান কেন নেওয়া হয়েছিল তা জানে না রত্না। কিন্তু রমেশ আচার্যের কথা শুনে তার বুকটা ঠাণ্ডা হয়েছিল একটু। হিন্দুদের শাস্ত্রে তাহলে কোথাও কোথাও মেয়েদের প্রতি একটু মায়াদয়ার কথাও আছে !

মায়ের মোট চারখানা বেনারসি বেরলো বাক্স থেকে। আর বেরলো কাঞ্জিপুরম, বাঙ্গালোর সিল্ক, গরদ, তাঁতের বেশ কয়েকটা। একদম তলার দিকে একটা কাঠের বাক্স। ভারী সুন্দর কারুকাজ করা। খুলে রত্না দেখল, তাতে সাতটা মোহর, তিনটে গলার চেন, চারগাছা চুড়ি, মুক্তোর দুল, টিকলি, বেশ কয়েকটা আংটি আর সোনাবাঁধানো নোয়া রয়েছে। গয়নার বাক্স মা সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে। বোধহয় এগুলো তাড়াহুড়োয় নিতে পারেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাক্সটা আবার যেমন কে তেমন স্যুটকেসে রেখে দিল রত্না। মায়ের কিছুই তার দরকার নেই। ওসব সে কখনও পরবে না, তার মেয়েকেও পরতে দেবে না। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে থেকে যেতে পারে। তবে সুখস্মৃতি তো নয়। এসব গয়নাগাঁটি আর শাড়ির বেশিরভাগই বাবা দিয়েছিল মাকে। রত্না জানে বাবা প্রায়ই তার মায়ের জন্য এটা ওটা হাতে করে নিয়ে আসত। এখন সেই বাবাই প্রতি রাত্রে বুকভরা বিষ নিয়ে ফেরে। আর বাড়ি এসে সেই অশ্রাব্য বিষ ওগড়ায়। চারদিকে বায়ু আর আবহাওয়া দূষিত হয় তাতে।

চোখ ভরে অনেকদিন পর মা মুখপুড়ি আর বাবা হতভাগার জন্য জল এল তার। দু'টো সুন্দর মানুষ এক মুহূর্তের মোহগ্রস্ততায় এমন মলিন হয়ে গেল কেন? মনোজকুমারের মধ্যে কী এমন খুঁজে পেল মা? আর বাবা? বাবাটা রাক্ষস হয়ে গেল।

রবিবার বেলা তিনটের সময়ে একটা ঝকঝকে আর্মাডা গাড়িতে যখন তাঁরা রওনা হল তখন বুকটা একটু কাঁপছিল রত্নার। মনের মধ্যে সেই দোলাচল, দ্বিধা। একই সঙ্গে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস। পেছনের সিটে একধারে সে, মাঝখানে মাসিমা, অন্য পাশে মেসোমশাই। ধীমান গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে বিমান। সবাই বেশ হাসিখুশি, ফুরফুরে মেজাজ। রত্নারই টেনশন। মধুরা তাকে মিথ্যে কথা বলেছে বলে তার মনে হয় না।

বিমানের মা খুব নিচু গলায় গুনগুন করে তাকে বলছিল, তোমার ওপরেই নির্ভর করে আছি মা। নিজের ওপর আর আমার বিশ্বাস নেই। ওই হতভাগী ছুঁড়িকে তো আমিই পছন্দ করে এনেছিলুম। কী সর্বনাশটাই হল বলো তো! তুমি একটু ভাল করে দেখো।

এটা কথার কথা। রত্না জানে, চোখে এবং মনে ধরলে তার মতামত উড়িয়ে দিতেও এদের বাধবে না। সুতরাং সে যে অপছন্দের কথা বলে সম্বন্ধটা কাটিয়ে দিতে পারবে তাও নয়। কটা পাত্রীকেই বা সে নাকচ করতে পারে। একটা বাতিল হলে আর একটার খবর আসবে। এই বাজারে এরকম সুপাত্রের কি কনের অভাব হবে?

গোপালগঞ্জ পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লাগল। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মহেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ি বলতেই লোকে দেখিয়ে দিল। ছিরিছাঁদ তেমন না থাকলেও বাড়িটা বেশ বড় এবং পুরোনো। খানিকটা জমিও আছে সঙ্গে। বেশ বাগান করেছে এরা।

ঘরের দরজায় মঙ্গলঘট বসানো, ধূপকাঠি জ্বলছে। ঐশ্বর্য না থাকলেও ঘরদোরে লক্ষ্মীশ্রী আছে। যা কিছু আছে সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহেন্দ্র হাতজোড় করে ভারী বিনয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। পরনে পাটভাঙা ধুতি আর জামা। বউটা ডুরে শাড়ি পরা, মাথায় ঘোমটা, গায়ে সামান্য গয়না, মুখে মিষ্টি হাসি। বেশ লোক এরা।

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে নজর রাখছিল রত্না। সে কোনও স্ট্র্যাটেজি ভেবে আসেনি। শুধু সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া। সুযোগ এলেও সেটা টেনে নেওয়া চাই। ভাংচি দেওয়ার মতো কিছু বললে হিতে বিপরীত হবে।

কৃশকায়া এক ঢল চুল আর নিষ্পাপ সুন্দর তিরতিরে মুখখানা নিয়ে যখন মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল তখন রত্না মুগ্ধ। আহা, কী কচি বয়স, কী স্নিগ্ধ চেহারা। যেন পটের ঈশ্বরী। প্রণাম করার ভঙ্গিটিও কী সুন্দর। গড় হল কিন্তু কারও পা ছুঁলো না। রত্না জানে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে নেই, তাতে গুরুজনদের আয়ুর হানি হয়। একটু বিভ্রান্ত ভাব আছে টানা টানা দুই চোখে। এ বেশি পুরুষসঙ্গ করেনি, বোঝাই যায়।

বাকি চারজনও বাক্যহারা হয়ে দেখছিল। মেয়েটি এসে দাঁড়াতেই ঘরের আবহে যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘরটা বড্ড নিশ্চুপ।

রত্নাই সেই অস্বাভাবিক নীরবতা ভেঙে প্রথম প্রশ্ন করল, এর বয়স কত?

মেয়ের মা বলল, দু মাস হল পনেরো পুরেছে।

এখনই বিয়ে?

গাঁ দেশ তো। এসব জায়গায় এরকম বয়সেই হয় যে!

আইনের কথাটা আর তুলল না রত্না। তুলে লাভ নেই। এখানে ওসব কেউ মানে না। বিমানের সঙ্গে বয়সের তফাতটা অনেক। কিন্তু সে কথা তুলে লাভ নেই। শাস্ত্রমতে পনেরো বছরের তফাত উত্তম।

বিমানের মা বলল, ফটো দেখেই আমার পছন্দ হয়েছিল। হ্যাঁ গো, তুমি কী বলো?

বিমানের বাবা ব্যক্তিত্বহীন মানুষ। বললেন, ওদের জিজ্ঞেস করো।

বিমান কোনও কথা বলল না। তবে চোরা চোখে দেখছিল মেয়েটিকে।

ধীমান বলল, একটাই অসুবিধে, একে বউদি বলে ডাকা যাবে না। বড্ড ছোট। হৈমন্তী বলে ডাকলে রাগ করবে না তো!

বিমানের মা তার দিকে চেয়ে বললেন, কী বলো রত্না, তারিখ ঠিক করতে বলে দিই?

তার মতামত নেওয়াই হল না। শুধু একটু অনুমোদন চাওয়া হল। তবে এ মেয়েকে নাকচ করারও কোনও পন্থা খুঁজে পাচ্ছিল না সে। এ মেয়েকে যে দেখবে সেই মুগ্ধ হবে। সুতরাং চেষ্টা করে লাভ নেই। রত্না একটু হাসল।

তারপর বলল, আপনি তো মেয়ের সঙ্গে কথাই বললেন না!

কী আর বলব। আমরা সেকেলে মানুষ, কথা তো বিশেষ জানি না। তা হ্যাঁ মেয়ে, আমাদের পছন্দ হয় তোমার? আমার মেয়ে নেই, ওই দুটি ছেলে। প্রাণটা মেয়ে-মেয়ে করে খুব। ঠাকুরের ইচ্ছেয় যদি কাজটা হয়ে যায় তাহলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও মায়ের অভাব টের পাবে না। বুকে করে রাখব।

মেয়েটি নতমুখে বসে আছে চৌকিতে। কিন্তু মুখে লজ্জার সুন্দর ভাবটা নেই। রত্নার মনে হল, যেটা আছে তা হল ভয়। মেয়েটা ভয় পাচ্ছে। মেয়েটার চোখে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তীব্র অনিচ্ছা। দেখাটায় ভুল থাকতে পারে।

বিমান আর বিমানের বাবা কোনও কথা বলল না, খাবারের প্লেট সবাই প্রায় স্পর্শ না করেই ফেরাল। কিছু কথা বলার চেষ্টা করল ধীমান।

সবার শেষে বিমানের মা বলল, আপনারা উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দিন। আমাদের পছন্দ হয়েছে। ফিরে গিয়ে আজই পুরুতমশাইকে দিন স্থির করতে বলে দেব। দু'চার দিনের মধ্যেই একবার চলে আসুন আমাদের বাড়িতে। দুপক্ষ মিলে দিন স্থির করাই ভাল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই পর্ব শেষে করে উঠে পড়ল সবাই। রত্না তার ব্যাগটা ইচ্ছে করেই পিছনের দিকে ঠেলে তাকিয়ার আড়ালে সরিয়ে দিল। তারপর উঠল।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে চমকে উঠে বলল, এই রে! আমার ব্যাগটা ফেলে এসেছি। ধীমানভাই এক মিনিট!

বলে দ্রুত পায়ে ফিরে এল। বউটি অবাক হল, বলল, কী হয়েছে?

কিছু নয়। ব্যাগটা ফেলে গেছি।

ওঃ, আসুন, আসুন।

ঘরে মেয়েটি তখনও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, এখন তার চোখ টলটল করছে জলে। এইরকমই আশা করেছিল রত্না। ব্যাগটা

তুলে কাছে গিয়ে খুব নিচু গলায় বলল, ইচ্ছে যদি না হয় তাহলে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে বিয়ে করতে যেও না। শক্ত হও। এখনও সময় আছে।

বলেই বেরিয়ে এল। এর বেশি আর কিছু করার ছিল না। যদি করে তা হলে এ বাড়ির লোক ও বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে। তার বদনাম হয়ে যাবে বিয়েতে ভাংচি দিয়েছিল বলে।

ফেরার পথটা কাটল হৈমন্তীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে। বিমান ছাড়া বাকি সকলেরই এক কথা, দারুণ মেয়ে। যেমন স্বভাব, তেমনি শ্রী। যেন লক্ষ্মী।

রত্নারও মনে হচ্ছিল, মেয়েটার মধ্যে একটা কিছু আছে। সুন্দর বলে নয়। একটা বাড়তি কিছু। ঠিক বোঝানো যাবে না কাউকে। মধুরার জবানবন্দি যদি সত্যি হয় তাহলে এমন সুন্দর মেয়েটি বিমানের হাতে পড়ে নষ্ট হবে। মধুরার তবু পিছুটান ছিল, দোষ ছিল। কিন্তু এ মেয়েটা তো নিষ্পাপ!

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে সে হঠাৎ প্রিয়কুমারকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা গো, বিমান ছেলেটা কেমন?

প্রিয়কুমার একটু অবাক হয়ে বলে, কেন, লোকে তো ভালই বলে।

তুমি কী বলো? সেই ছেলেবেলা থেকে তো দেখছ।

প্রিয়কুমার একটু চিন্তিত মুখ করে বলল, বলব? বলা উচিত কিনা জানি না। বিমানকে দেখেছি বেশ বড় বয়স পর্যন্ত বাগানে প্রজাপতি ধরে ধরে পাখা ছিঁড়ত। আর মেয়েরা যখন ইস্কুলে যেত তখন ছাদ থেকে লুকিয়ে ঢিল মারত। ছেলেবেলায় ওসব করে। কিন্তু ও বড় বয়স অবধি করেছে, ওসব না ধরলে ভালই তো।

পাঁচ

পাঁচলা গ্রামটার নামই দিয়েছে লোকে ল্যাল গাঁ। এ হচ্ছে ল্যাল লাল গাঁ। এখানকার একটা ভোটও অন্য কোনও পার্টি পায় না। দলের অফিসটাও করেছে জব্বর। দিব্যি পাকা দোতলা। ভিতরে মিটিংঘরটর আছে। একটা গেস্টরুম। এখানে মিটিং ডাকলেই চার পাঁচ হাজার লোক জমে যায়। কখনও দশ-বারো হাজার। তা বলে গাঁয়ে যে শীতলা বা শনিপুজো হয় না তা নয়। অরুণদা বলে, ওগুলো হচ্ছে নেসেসারি ইভিল। দরকার হলে ধর্মের ভিতর দিয়েই পার্টি প্রিচিং দেবে।

এ পর্যন্ত পাঁচলা গ্রামে বার দশেক মিটিং করেছে রতন। অরুণদার সঙ্গে। গত দুবার সে বক্তৃতা দিয়েছে। অরুণদা বলে, এসব মিটিঙে নেট প্র্যাকটিসটা করে নে। পরে শহরের মিটিং-এও বলবি।

রতন বক্তৃতা কিছু খারাপ দেয়নি প্রথমবার। কিছু কথা তো শেখাই

আছে। বলতে আটকায় না। প্রথমবার হাততালিও পেয়েছিল। এবার হাততালির জোর বেড়েছে। তার কারণ এবার রতনের বক্তৃতায় একটু স্ফুলিঙ্গ ছিল। এও নতুন নয়। তবু তার দিঘল সুন্দর চেহারা, কম বয়স আর ভরাট গলায় বক্তৃতার একটা উপভোগ্যতাও হয়তো আছে।

বক্তৃতার পর অরুণদা পিঠে হাত রেখে বলল, যার যে গুণটা আছে সেটাকেই পার্টির স্বার্থে লাগিয়ে দিতে হয়। এই ব্যাপারটা তুই শিখে গেছিস। বাঃ, খুব খুশি হয়েছি।

এই নতুন আত্মপ্রকাশ রতনের বুক আজ আনন্দে ভরে রেখেছে। সে এখনও পার্টির মেম্বার নয় বটে, কিন্তু জমি তৈরিতে তার অবদান থেকে যাচ্ছে।

মিটিঙের পর মঞ্চ থেকে নেমে দুতিনজন মিলে একটু ফাঁকার দিকে হাঁটছিল।

একটা লোক এসে ডাকল, এই যে রতনবাবু, একটু শুনবেন?

রতন ফিরে লোকটিকে দেখল, মধ্যবয়সী একজন মানুষ। কাঁচা পাকা দাঁড়ি গোঁফ, মাথার ঝাঁকড়া চুলেও সাদা কালোর মিশেল। দীন-দরিদ্র পাকানো চেহারা, কোটরগত চোখ, সামনের ওপর পাটির দুটো দাঁত নেই। গায়ে মোটা কাপড়ের ছিটের হাফশার্ট, পরনে আধময়লা ধুতি।

দুপা পিছিয়ে রতন বলল, বলুন।

বেশ বললেন কিন্তু আজকে। খুব ভাল লাগল। আমিও একটু আধটু বক্তৃতা দিতুম একসময়ে। আজকাল আর দিই না। ডাকেও না কেউ।

রতন একটু হাসল। কাঁচা বয়সে প্রশংসা পেতে কার না ভাল লাগে।

জিজ্ঞেস করল, আপনি পার্টির মেম্বার নাকি?

সে তো অনেক বড় কথা। না, মেম্বারটেম্বার নই। কর্মী বলতে পারেন। তাও সময় দিতে পারি কই? তবে ইচ্ছে ছিল খুব। এখনও নেশার টানের মতো এসে মিটিং শুনি। আপনি বেশ ভাল বলেন। আগের বক্তৃতাটাও শুনেছি। এবারেরটা আরও ভাল। তা হলে কি রাজনীতি নিয়েই থাকবেন বলে ঠিক করেছেন? নেতাটেতা হওয়ার ইচ্ছে আছে?

আরে না না। কমিউনিস্টরা নেতা হতে চায় নাকি? পার্টির হয়ে কাজ করে যাওয়াটাই হল আসল কথা।

ওটা তো কথার কথা। ব্যক্তিগত টার্গেট বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

মাথা নেড়ে রতন বলে, আমার নেই। রাজনীতিই করে যাব কি না তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিছু করার নেই বলে করছি আর কি।

বাঃ বেশ স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলেন তো। বাঃ খুব খুশি হলাম। ডেডিকেশন জিনিসটা তো জোর করে হয় না। ওটা আসে। কাজ করতে

করতে আসে। এ দেশে মার্ক্সিজমের খুব সুবিধে ছিল, বুঝলেন! গরিব ভুখা দেশ, এত বেকার, এত দুর্নীতি। কিন্তু ডেডিকেশন আর সৃষ্টিমূলক চিন্তার অভাবে কিছুই হল না।

আপনার নামটা জানতে পারি?

হ্যাঁ। আনন্দ চ্যাটার্জি। স্কুলে পড়াই। সামান্য চাষবাস আছে।

লোকটার কণ্ঠস্বরে আত্মগ্লানি আর হতাশাটা গোপন থাকল না।

পাঁচলায় থাকেন কখনও দেখিনি তো আগে।

না। আমি থাকি আরও উত্তরে। গাঁয়ের নাম সাতক্ষীরা।

নামটা শোনেনি রতন। এদিককার সব জায়গাই সে চেনে। এই গ্রামটা চেনা মনে হল না।

লোকটা পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আপনার ভিতরে নেতা হওয়ার এলিমেন্ট আছে। ইচ্ছে করলে হতেও পারেন। তবে ওই অরুণবাবুর কিছু হবে না।

কেন?

ভাল কর্মী, কিন্তু ভেতরে মাল নেই। ওই যাকে বলে এলিমেন্ট।

সেটা খানিকটা রতনও বোঝে। অরুণদার দাপট নেই, সবাইকে তুইয়ে বুইয়ে চলে। দিনরাত পার্টির কাজ করে যায় বটে, কিন্তু এখনও ব্যক্তিত্ব বলে কিছুই তৈরি হয়নি। তবু অরুণদাই গোটা এলাকার পার্টিটাকে ধরে রেখেছে। সে বলল, অরুণদা নেতা হতে চান না তো!

না চাইলে তো ভালই। চাইলেও পেরে উঠতেন না। অনেকদিন ধরেই দেখছি তো! একটু থেমে লোকটা বলল, আপনাকে তিনখানা বই পড়তে বলি। গালিভার্স ট্র্যাভেলস, রবিনসন ক্রুশো আর আঙ্কল টমস কেবিন। যে-কোনও কমিউনিস্টেরই বই তিনখানা বারবার পড়া উচিত। ছোট মানুষদের সংগ্রামের কথা ওরকম আর হয় না। পড়লে ভিটামিনের কাজ করবে।

একটু তফাতে মাঠের মধ্যে একজন বউমানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঘোমটা দিয়ে। ঘোমটার তলাটা হাত দিয়ে টেনে মুখের নিম্নাংশ ঢেকে রেখেছে। সঙ্গে একটা বছর দশেকের রোগা মেয়ে।

লোকটা বলল, ওই আমার পরিবার। মিটিং শুনতে এনেছিলাম। আচ্ছা, চলি তা হলে।

বউমানুষটি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে। চোখটা অবশ্য ঘোমটার আড়ালে দেখা যাচ্ছিল না।

খুব ধীর পায়ে লোকটা তার পরিবারের দিকে এগিয়ে গেল। রতন আর তার সঙ্গীরা চলল পার্টি অফিসের দিকে। সেখানে চা-সিঙাড়ার আয়োজন হয়েছে।

পাঁচলার পার্টি অফিসে খানিকক্ষণ আড্ডা হল। তারপর এক কমরেডের মোটরবাইকের পিছনে বসে বাড়ি ফেরা। সারাক্ষণ বারবার

ওই লোকটা আনন্দ চ্যাটার্জির কথাগুলো মনে পড়ছিল তার। "আপনার ভিতর নেতা হওয়ার এলিমেন্ট আছে।" কিন্তু নেতাটেতা হওয়ার কোনও ইচ্ছেই হয় না তার। সারাক্ষণ পার্টি করতেও তার ভাল লাগে না।

গাঁয়ে ফিরে একটু টহল মেরে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল রতনের। মনটা বেশ ভাল লাগছে। কেন লাগছে তা বুঝতে পারছে না। লোকটার ওই কথাটাই কি? আপনার ভিতরে নেতা হওয়ার এলিমেন্ট আছে!

রোজই রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বই পড়ে রতন। বহু কালের অভ্যাস। বই না পড়লে তার ঘুম আসে না। বাছাবাছি নেই, যখন হাতের কাছে যা থাকে পড়ে। আজ পেয়ে গেল আইনস্টাইনের জীবনীখানা। রুশ ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ।

শুনতে পেল বাবা রোজকার মতোই মাতাল হয়ে গালাগাল দিতে দিতে ফিরছে। একটু দূর থেকে কথাগুলো ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। উঠোনে ঢোকার পর শোনা গেল, কম দিয়েছি শালীকে? কিছু কম দিয়েছিলাম? সোনাদানা, শাড়ি, সেন্ট, পাউডার কিছু কম দিয়েছি? এই তার প্রতিদান? খচ্চর মাগি! খচ্চর...খচ্চর... উইপোকা লাগবে তোর অঙ্গে...

বই বন্ধ করে উঠল রতন।

বাবা!

কে রে?

চুপচাপ ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ো।

অ্যাঁ! কী বলছিস?

আর টুঁ শব্দটিও করবে না। ঘরে যাও।

অভিরাম একটু দুর্বল গলায় বলে, কারটা খাই পরি? অ্যাঁ!

ঘরে চলে যাও। আর কথা নয়।

যাচ্ছি তো। চেঁচাচ্ছিস কেন?

আমি চেঁচাচ্ছি না। তুমিই চেঁচাচ্ছ। আর কথা নয়।

ঠিক আছে। যাচ্ছি।

অভিরাম সত্যিই চুপ মেরে গেল। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং তার নাক ডাকতে লাগল। কদিন ধরেই এটা চলছে। রতন ধমক দিলেই অভিরাম চেঁচামেচি বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনিতে সারাদিন বাপ-ব্যাটায় দেখাও হয় না, কথাও হয় না।

রতন শুয়ে পড়তে গিয়েও ফের ফিরে এসে বাবার ঘরে উঁকি দিল। অঘ্রানের শেষে বেশ জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। হু হু করে উত্তুরে হাওয়া বইছে। বাবা একটু কুঁকড়ে শুয়ে আছে, গায়ে চাপাটাপা দেয়নি। মাতালের তো ওসব খেয়াল থাকে না। গায়ে শার্ট ছাড়া কিছু নেই। রতন গিয়ে দেখল, বিছানায় কাঁথা বা কম্বল কিছুই নেই। বিছানাটা বিকেলে

পেতে দিয়ে যায় ঝি কাতু। তার সব দায়সারা কাজ। রতন কাঠের আলমারিটা খুলে একটা মোটা কাঁথা পেয়ে গেল। যত্ন করে ঢেকে দিল অভিরামকে। বাবার চেহারাটা খারাপ হয়েছে খুব। বয়স এখনও পঞ্চাশও হয়নি, তবু বুড়োটে ভাব যেন। গালের হনু বেরিয়ে পড়েছে। চলে আসতে গিয়ে রতন আজ প্রথম লক্ষ করল, খাটের পাশে একটা টুলে বাবার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। আশ্চর্য! কোনওদিন তো রাতে বাবাকে খেতে দেখে না সে। এসেই শুয়ে পড়ে বাবা। এটা তো কেউ লক্ষও করেনি এতদিন।

রতন বই রেখে শুয়ে পড়ল। মনে একটা সূক্ষ্ম আনন্দের রেশ। আপনার ভেতরে নেতা হওয়ার এলিমেন্ট আছে। ঘুম চলে এসেছিল প্রায়। চোখে হিজিবিজি স্বপ্নদৃশ্য ভেসে যাচ্ছিল। তার মধ্যেই হঠাৎ দেখতে পেল, বিশাল একটা ফাঁকা মাঠের চালচিত্র পিছনে নিয়ে ঘোমটা টানা এক বউমানুষ দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরমূর্তির মতো। স্থির চোখে তাকে দেখছে। ধড়াস করে উঠল বুক। পট করে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। কে ওটা? কেন ওরকম স্থির দৃষ্টিতে দেখছে তাকে? কে?

জেগেও কেন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করল রতন। নাঃ ওটা কিছু নয়। সাব-কনশাসে কত কী লুকিয়ে থাকে।

যেমন মারিয়া। রোজ রাতে সে মারিয়াকে ভাবে। রোজ মারিয়াকে স্বপ্ন দেখে। এক রাতে মারিয়ার সঙ্গে নিষিদ্ধ যৌনমিলনের স্বপ্ন দেখে স্খলনও হয়ে গেল তার। কী লজ্জা! বউদি হয় না! ছিঃ ছিঃ। জোর করে মনের ঘর থেকে মারিয়াকে কত বার বের করে দেয় সে। কিন্তু মারিয়া ঠিক চোরাপথে ফের ঢুকে পড়ে।

জ্যাঠাইমা আজকাল প্রায়ই সকালে একটু বেলার দিকে তার কাছে এসে বসে। প্রথমে নানা ধানাই পানাই কথা।

পয়সাকড়ির তো আর অভাব নেই রে বাবা, করেকম্মে খেতেও হচ্ছে না তোকে। কিন্তু বাপটার অবস্থা দেখেছিস? কী চেহারা হচ্ছে দিনদিন! ভয় হয়, একটা শক্ত অসুখবিসুখ না করে বসে।

সে তো বুঝলুম জ্যাঠাইমা, তোমার আসল মতলবটা কী?

জ্যাঠাইমা জুল জুল করে মুখের পানে চেয়ে থেকে বলে, বললেই তো ফোঁস করে উঠিস। বলি যা গেছে তা তো গেছেই। যা আছে তাই নিয়েই তো থাকতে হবে মানুষকে, নাকি?

হ্যাঁ বুঝেছি।

তা বড় হচ্ছিস, বুঝতে হবে না? উড়নচণ্ডী হয়ে থাকলেই হবে?

বিয়ের কথা তো!

একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাব না বাবা।

ওসব মতলব ছাড়ো। ও হবে না।

ওরে শোন না, জ্যোতিষীকে তোর কুষ্ঠি দেখিয়েছি। সে বলেছে তোর বউ খুব লক্ষ্মী হবে।

জ্যাঠাইমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার বড় মায়াও হয়। জ্যাঠাইমা ভাবে সে বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সমস্যা যে বাড়তেও পারে সেটা জ্যাঠাইমাকে বোঝানো মুশকিল। অন্য উপায় না পেয়ে এখন জ্যোতিষী ধরেছে।

আমি কি ওসব মানি জ্যাঠাইমা?

কেন, পার্টি করলে বুঝি ওসব মানতে নেই? মানামানি তো সব তুলেই দিলি তোরা! ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায় বাবা। একটা ছেলে তো গেরুয়া পরে গান গেয়ে বেড়ায়, তাও নয় সয়ে ছিলুম। কোত্থেকে গরুখেকো খটাশে একটা মেম ধরে নিয়ে এসে হাজির করল বল তো! দু'দিন পর তাকে যদি সিঁদুর পরিয়ে ঘরে এনে তোলে তাহলে কী কাণ্ড হবে বল দেখি! ওই সব ভয়েই তো মরছি।

মারিয়া বউদি কি খারাপ জ্যাঠাইমা?

থাক, আর গাল ভরে বউদি ডাকতে হবে না। জাতজন্মের ঠিক নেই, আচার-বিচার নেই। হেগে হাত ধোয় না, এ বাড়ি তো ধর্মশালা নয় যে ঢুকে পড়লেই হল। আমি বলেই দিয়েছি, বাইরে যা করার করো গে দেখতে যাচ্ছি না, কিন্তু পাকাপাকি ঘরে এনে তুললে আমি গলায় দড়ি দেব।

হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, তুমি কি পাড়াগাঁর বায়ুগ্রস্ত বুড়িদের মতো হলে? তোমার বয়স তো এখনও পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। তার ওপর মাধ্যমিক পাশ। তোমার মুখে কি ওসব কথা মানায়? মারিয়াও তো এক মানুষ মায়ের গর্ভেই জন্মেছে। তাকেও তো আদরে সোহাগে বড় করেছে তার মা-বাপ। গায়ে মানুষের রক্ত, তোমার আমার মতোই। শুধু গায়ের রংটা ফর্সা আর ইংরিজিতে কথা কয় বলে অত হ্যাকছি করতে আছে? সেও কি তোমার কেষ্টর জীব নয়?

কী জানি বাপু, দুনিয়ার অত খবর কি রাখি? শুধু বুঝি, ওরা অন্যরকম মনিষ্যি। তেলেজলে মিশ খায় না বাবা। জুড়ানকে নিয়েই কি শান্তিতে আছি! কাকে পছন্দ করে রেখেছে ভেঙে বলছেও না। অজাত-কুজাত কী ধরে আনে কে জানে! নাকি বামুনের মেয়ে এনেই হাজির করল মাহিষ্যের ঘরে। তাতে যে মহাপাতক। বয়স কি আর বছরে বাড়ে বাপধন, বাড়ে দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে। পঁয়তাল্লিশেই যেন মনে হয় জবুথবু হয়ে পড়ছি।

আমি কাউকে ধরে আনব না জ্যাঠাইমা, নিশ্চিন্তে থাক গে।

সে না হয় না আনলি, কিন্তু তোদের সংসারটাও তো দেখতে হবে? একান্ন ছিলুম সে না হয় মিলেজুলে হয়ে যেত একরকম। কিন্তু ভাগজোখ হলে তুই তো জলে পড়বি বাপ। কে রাঁধে বাড়ে, কে সংসার সামলায়,

কে তোর বাপকে চারটি যত্ন করে খেতে দেয়।

ভাগজোখের কথা উঠছে কেন জ্যাঠাইমা? ভাগজোখের কথা কি উঠেছে?

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একটু গলা নামিয়ে বলল, সে কি আর উঠতে নেই? সংসার বড় হচ্ছে। ব্যবসার আয়বায় ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও কথা উঠছে। তাছাড়া আমাদের লক্ষ্মীমন্ত সংসার দেখে গাঁয়ের পাজি লোকগুলোর চোখ টাটায় কিনা। তারাও এসে শলাপরামর্শ দিচ্ছে। আজ হোক কি দু-চার বছর পরেই হোক ভাগ-বাঁটোয়ারা হবেই। তোর বাবা যতদিন খাড়া ছিল ততদিন ওসব নিয়ে কেউ ভাবেনি। সে সব দেখেশুনে রাখত। কারবার বাড়াত, এক পয়সা অবধি ভাগজোখ বুঝিয়ে দিত সবাইকে। কিন্তু তোর বাবাই যে কেমনধারা হয়ে গেল! শিবরাম কি রামরাম বল কি তোর জ্যাঠাই বল কারও মাথায় তো ওর মতো বুদ্ধি নেই। একাই ও একশ ছিল। যেমন দাপুটে তেমনি সাচ্চা। ও কাত হয়ে পড়ায় সংসারও কেতরে যাচ্ছে দেখিস না।

আমাদের আর বিষয় সম্পত্তি দিয়ে কী হবে বলো! আমার তো দরকার নেই। বাবাকে একটা মাসোহারা দিও, তাহলেই হবে। আমি ভাবছি পার্টি অফিসেই গিয়ে থাকব। আমার চলে যাবে।

জ্যাঠাইমা চোখ বড় বড় করে তার দিকে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থেকে বলল, এসব কুবুধে কথা তোর মাথায় কে ঢোকাচ্ছে বল তো! ওই অরুণ হনুমানটা নাকি? গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খেল হতভাগা। তোমার পার্টি করা বের করছি, দাঁড়াও। এমন দিব্যি দিয়ে রাখব যে আর ওমুখো হবি না।

রতন হেসে ফেলল। বলল, এতই যদি তোমার দিব্যির জোর তাহলে পরাণদাকে দিব্যি দিলে না কেন?

জ্যাঠাইমা করুণ মুখে বলল, সে কি আর দিইনি! কিন্তু কে মানে বল! দোহাই বাবা, লক্ষ্মী বাপ আমার, মাথা থেকে ওসব ভাবনা তাড়িয়ে দে। ওসব বলে আমার বুকের ধড়ফড়ানি যে আরও বাড়িয়ে দিলি।

মাথা নেড়ে রতন বলে, আমার বিষয়বুদ্ধি নেই জ্যাঠাইমা, ওসব আমার ভালও লাগে না। আমাকে ওর মধ্যে জড়িও না।

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ মুখ চুন করে বসে রইল। চোখ ছলছলে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে অবরুদ্ধ গলায় বলল, শুধু কি ভাবি জানিস, একটা ঘটনা থেকে জল কদ্দূর গড়ায়। সাবিত্রী যদি চলে না যেত তাহলে তোর বাবাও ঠিক থাকত। আর তোর বাবা ঠিক থাকলে এই সোনার সংসার ডুবত না। সেই মুখপুড়ি বুঝি টেরও পায় না কতদূর সর্বনাশ করে গেছে।

জ্যাঠাইমার দুটো হাত ধরে রতন মায়াভরা গলায় বলল, কেঁদো না জ্যাঠাইমা, সংসারে এসব তো হতেই পারে। সব সংসারই ভাঙে।

চিরকাল কি সব একরকম থাকে, বলো! যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ কী?

আজ তোর মা থাকলে তুই কি পার্টি অফিসে গিয়ে থাকার কথা ভাবতে পারতিস। সত্যি করে বল তো!

তা তো জানি না। তবে পার্টি অফিস কিন্তু খারাপ জায়গা নয় জ্যাঠাইমা। সেখানে পাঁচটা লোক আসে, মানুষের ভাল মন্দ নিয়ে কথা হয়, গাঁয়ের উন্নতি নিয়ে আলোচনা হয়।

জ্যাঠাইমা উঠে পড়ে বলল, জানি জানি। কতগুলো হাড়হাভাতে, লক্ষ্মীছাড়া গিয়ে জুটেছে সেখানে। এত অশান্তিতে আমি একদিন হার্টফেল হয়ে মরে যাব। দেখিস।

জ্যাঠাইমা চলে যাওয়ার পর রতন অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে চুপ করে বসে রইল, কেন যে সেই বউমানুষটার কথা বারবার মনে পড়ছে। কোনও ঘটনাই তো নয়। পিছনে মাঠ ফাঁকার মধ্যে রোগা একটা মেয়ের সঙ্গে ঘোমটা দেওয়া একটা বউ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভুলতে পারছে না রতন। বারবার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

আনন্দ চ্যাটার্জি নামে কোনও পার্টি ওয়ার্কারকে কেউ চিনতেই পারল না। অরুণদা বলল, ও নামে কেউ তো আমাদের দলে ছিল না। সাতক্ষীরা গ্রাম : এরকম গ্রাম থাকলে কি মনে পড়ত না? গোটা পরগনা আমি হাতের তেলোর মতো চিনি।

তবে কি লোকটা তাকে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে? তারই বা দরকার কী ছিল? কিছু লোক আছে মিথ্যে কথা বলে আনন্দ পায়, ভাবে লোককে খুব ঠকালুম।

মন খারাপ হলে সে ছোট খুড়িমার কাছে গিয়ে বসে। খুড়িমা একটু বন্ধুর মতোই। তাকে খুব মায়া করে।

বলল, বোস। মুখটা শুকনো কেন রে?

ও অমনি। হ্যাঁ খুড়িমা, শুনছি বাড়ি সম্পত্তি কারবার সব নাকি ভাগ হবে?

খুড়িমা হাসল। বলল, আমি বউ মানুষ, আমার কাছে কি আর ভেঙে কেউ কিছু বলে?

ছোটকাকা কিছু বলেনি?

বলেছে, তোর কাকা, বড় আর সেজো ভাসুর কেউই নাকি ব্যবসা ঠিকমতো চালাতে পারছে না। ধারবাকি পড়ে যাচ্ছে। আগের মতো আয় নেই।

তাই নাকি? আমি কিছু শুনিনি তো!

এখনই হইচই ফেলার মতো কিছু নয়। তবে সবাই বেশ ভাবনায় পড়েছে। তোর ছোট কাকা বলছিল, মেজদার আমলে ব্যবসা কিরকম রমরম করে চলত। বছরে দু-তিন লাখ টাকা আসত ফেলে ছড়িয়ে।

মেজদা বসে যাওয়ার পর থেকেই মন্দা যাচ্ছে। ভাইরা তাই কারবার বেচে দেওয়ার কথা ভাবছে। চাষবাস থাকবে, ব্যবসা বেচে টাকা হাতে রাখবে সবাই।

বিষয়-সম্পত্তিও ভাগ হবে?

হবে। সকলেরই মত হল এইবেলা ভাগ না হলে পরে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। ছেলেপুলেরা বড় হচ্ছে। ওসব নিয়ে ভাবছিস কেন? এখনই তো হচ্ছে না।

রতন হাসল, আমার তো ওসব ভাবনা নেই। জ্যাঠাইমাকে তো বলেই দিয়েছি আমার কিছু চাই না। বাবা যতদিন বাঁচে তোমরা দেখবে। আমি পার্টিতে জয়েন করে ওই অফিসেই থাকব।

বাঃ! এ না হলে বুদ্ধি! তুই পার্টি অফিসে গিয়ে থাকলে তোর বাবাকে দেখবে কে?

বাবা! বাবাকে দেখার কী আছে! তোমরাই তো দেখছ। বাবা তো আর পঙ্গু অশক্ত নয়, বুড়োও হয়নি।

সে না হয় আজ। কিন্তু তারপর একদিন তো শরীর ভাঙবে, বয়স হবে।

তখন দেখা যাবে। লোক রেখে দেব।

ওরে, মাইনেকরা লোকেরা কেমন দেখাশোনা করে তা কি জানিস? তাদের কি কোনও গরজ থাকে?

আমিও তো আর বাবার দেখাশুনো করছি না। তুমি তো জানো, লোকটার ওপর আমার রাগও আছে, ঘেন্নাও আছে। বাবার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।

ছোট খুড়িমা হঠাৎ ঝামড়ে উঠে বলল, প্রায়ই তুই কথাটা বলিস। কেন রে, মেজদা কী এমন অন্যায়টা করেছে বল তো। লম্পট দুশ্চরিত্র নয়, কোনও দিন কেউ লোকটার চরিত্রের এতটুকু বদনাম করতে পারেনি। এত যে বিষয়সম্পত্তি সব সামাল দিত। ভাইরা কখনও বলেনি যে মেজদা আমাদের ঠকাচ্ছে। সারা গাঁ ঘুরে দেখে আয় তো, শুনে আয় ওই লোকটার নিন্দে করে কিনা কেউ। কী অপরাধ করেছে বল তো তোর বাপ! মদ খেয়ে গালাগাল দেয় তোর মাকে? নিজেকে তোর বাপের জায়গায় বসিয়ে একটু চোখ বুজে ভাব তো, খুব অন্যায় করে কিনা।

একটু থতমত খেয়ে গেল রতন। ঠিক এরকম রি-অ্যাকশন সে আশা করেনি।

ছোট খুড়িমা ফের তেজের গলায় বলল, দেশোদ্ধার করতে যাবি ভাল কথা। কিন্তু যার শোকাতাপা বলে ঘরে একা পড়ে থাকে সে বাপকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে জনগণের গলা ধরে সোহাগ করতে গেলে লোকে হাসবে যে! ওই কাছের লোকটাকেই বুঝতে পারলি না তুই,

হাজার লাখ মানুষের দুঃখের তুই কী বুঝবি রে হতভাগা!

অবাক হয়ে রতন বলে, তুমি তো সাংঘাতিক ভাষণ দিতে পার খুড়িমা! মঞ্চে তুলে দিলে তো ফাটিয়ে দেবে!

ছোট খুড়ি হেসে ফেলল। বলল, আর হাড় জ্বালানো কথা বলিসনি। আমি ভাদ্দর বউ, সংসারে বাঁধে, নইলে ওই মানুষটার একটু আধটু দেখাশোনা আমিই করতুম। লোকটাকে দেখে যে কেন তোর মায়া হয় না বুঝি না। এমন বিষচোখে দেখলি কেন রে? এতটাই কি খারাপ মানুষ তোর বাবা?

রতন একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, বাবা রাতে কিছু খায় না। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে, সেটা ছুঁয়েও দেখে না। কাতু তো কাউকে কিছু বলে না, সকালে বোধহয় থালাসুদ্ধ নিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়।

ফেলে দেয় না ছাই। ও নিজেই গপগপ করে খায়। সকালে কয়েকদিন দেখেছি, এঁটো থালা থেকে কী যেন নিয়ে মুখে পুরতে পুরতে তোদের ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরঘাটে গেল। লোক রেখে দিবি বলছিলি, সেই লোকের হাতে তোর বাপের কী অবস্থা হবে বুঝছিস তো!

বাবা বেশ রোগাও হয়ে গেছে দেখলাম।

যাক, চোখের দৃষ্টি খুলেছে তাহলে!

না, চোখ খোলেনি রতনের। বাবার প্রতি তেমন কোনও সহানুভূতিও সে বোধ করে না। তবে তার মনে হচ্ছে বাবার সঙ্গে তার এতটা ফাঁক হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি আছে। এই যে তার বাবা কোনও রাতেই কিছু খায় না, খাবার ঢাকা দেওয়া পড়ে থাকে এটা তার লক্ষ করা উচিত ছিল।

সারাদিন আজ পার্টি অফিসেই কাটাল রতন। দিনের বেলা মাতব্বররা ফিল্ড ওয়ার্কে বেরিয়ে যায়। অফিস আগলায় কয়েকটা চ্যাংড়া প্যাংড়া। দিনের বেলাতেও পার্টি অফিসে দূর দূরান্ত থেকে দু-চারজন লোক আসে। তাদের প্রশ্ন থাকে, সমস্যা থাকে, খোঁজ খবর নেওয়ার থাকে, নালিশ থাকে। অনভিজ্ঞ চ্যাংড়া ছেলেরা ঠিকঠাক সামাল দিতে পারে না। আজ পার্টি অফিসে বসে অনেক কাজ করল রতন। লেখাপড়ার কাজ, লোকের সঙ্গে কথা বলার কাজ। মনে একটু মেঘ ছিল। সেটা উড়ে গেল এই করতে গিয়ে। সন্ধেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে এল। সংসারের মধ্যে যেসব জটিলতা নিত্য পাকিয়ে ওঠে তার মধ্যে সে আর থাকতে চায় না। বাইরের কাজই ভাল। এই যে বাড়ি সম্পত্তি ভাগাভাগি হবে, ব্যবসা বিক্রি হয়ে যাবে এগুলো নিয়েও মন ভারাক্রান্ত করতে চায় না সে। যা হচ্ছে হোক। নিজের পন্থা সে ঠিক করে নিয়েছে।

মার্ক্সবাদ যে সে খুব ভাল বোঝে তা নয়। একটু আধটু জানে মাত্র। সে তো মার্ক্সিয় দার্শনিক হবে না কোনওদিন। হবে একজন কর্মী। আর কর্মীদের আসল কাজ হল করণীয়টা বুঝে নেওয়া। করতে করতেই অনেকটা শেখা যায় মার্ক্সবাদ। মাঝে মাঝে নেতারা এসেও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। তাই যথেষ্ট। খুব বেশি জেনে তার লাভ নেই।

রহস্যময় আনন্দ চ্যাটার্জি তাকে তিনটে বই পড়তে বলেছিল। আঙ্কল টমস কেবিনের গল্পটা সে জানে না। তবে রবিনসন ক্রুশো আর গালিভারস ট্রাভেলসের গল্প সে একটু শুনেছে। ফেরার পথে শীতলামাতা গ্রন্থাগারে গিয়ে সে বই তিনটের খোঁজ করল। লাইব্রেরির তরুণদা বলল, ওসব বই তো কেউ চায় না, তবু বোস, দেখছি।

খুঁজে পেতে রবিনসন ক্রুশো বইটা পাওয়া গেল। ইংরিজিতে। তরুণদা নিজেই অবাক হয়ে বলল, একটা বই আছে দেখছি! তবে ইংরিজি। তোর চলবে?

তাই দিন। চেষ্টা করে দেখি।

খাতায় এন্ট্রি করে নিয়ে যা।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বইটা নিয়ে বসল সে। ইংরিজি বই পড়েনি কখনও। শক্ত লাগবে এই ভয়েই পড়েনি। কিন্তু বইটা খুলে হোঁচট খেতে খেতে পড়তে পড়তে একটু বাদে দিব্যি গল্পটার মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। নির্জন দ্বীপ, চারদিকে অকূল সমুদ্রের বিস্তার। একা একজন সহায় সম্বলহীন মানুষ। কিছু নেই তার, তবু সে বাঁচার উপকরণ ঠিক জোগাড় করছে। হার মানছে না। নিজের চারদিকে সেই ফেনিল সমুদ্রের গর্জন যেন শুনতে পাচ্ছিল রতন।

কী হাল করেছিস আমার দেখে যা খানকি মাগি। দেখে যা। মুখে রক্ত উঠে মরবি না। বল রক্ত উঠবে না তোর গলা দিয়ে?

বই রেখে রতন উঠল।

বাবা!

কে? কে রে?

ফের চেঁচাচ্ছ!

কোথায় চেঁচালুম!

চুপ করে ঘরে ঢুকে যাও।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। কারটা খাই না পরি?

চটি ছেড়ে খাটে উঠে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল অভিরাম।

রতন গিয়ে সামনে দাঁড়াল, শুয়ে পড়লে যে!

অভিরাম অবাক হয়ে বলল, শোবো না?

খাবারটা কে খাবে? উঠে খেয়ে নাও।

খাবার! কিসের খাবার?

তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। খেয়ে নাও।

খাব। খাব কেন?

তোমার খিদে পায় না?

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রতনের দিকে চেয়ে অভিরাম বলল, খিদে?

হ্যাঁ। ওঠো, খেয়ে নাও।

রতন নিজেই গিয়ে থালার ঢাকনা সরিয়ে দিল। ভাত, মাছ, তরকারি, এক বাটি দুধ, সবই দেওয়া হয় বাবাকে রোজ। লোকটা কোনওদিনই খায় না।

ওঠো। খেয়ে নাও।

অভিরাম ছেলের দিকে আর একবার চোর বেড়ালের মতো তাকিয়ে ফ্লারিশিং অবস্থাটা নেই তা বুঝতে পারি। আর তা হবে না কেন? অভিরামদা যে পরিশ্রম করতেন, মোটরবাইকে চেপে রোজ সদরে যাওয়া আসা, গাঁ গঞ্জের কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ সেসব তোর কাকা জ্যাঠারা করে নাকি? তারা তো অভিরামদার আমলে বাবুগিরি করে বেড়াত। এখনও গ্যাঁট হয়ে বসে ব্যবসা চালায়। ওতে হয় নাকি? পি আর বলে কিছু নেই, গতর খাটায় না। ওভাবে হয়?

আমি কখনও বুঝতে পারি না গাঁয়ের লোক আমার বাবা সম্পর্কে কী ভাবে।

ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? আমি যতদূর জানি লোকে অভিরামদার জন্য দুঃখই পায়। সেই বিচ্ছিরি ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই তো অভিরামদা কেমন পাগল-পাগল হয়ে গেল।

লোকে খারাপ ভাবে না?

দেবদাসকে কি লোকে খারাপ ভাবে? তোর বাবার অনেকটা ওরকম অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ এতদিন পর এসব কথা কেন?

গত চৌদ্দ বছর ধরে বাবার ওরকম বিশৃঙ্খল জীবন দেখে আমার খুব রাগ ছিল। লোকটাকে নিয়ে কখনও ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে লোকটাকে আমার আর একটু জানবার চেষ্টা করা উচিত ছিল।

বড্ড দেরি করে ফেলেছিস। এখন কি আর তাতে লাভ হবে? ঢালুতে পড়ে গেলে মানুষ গড়িয়ে যায়। ঠেকানো মুশকিল।

ঠেকাতে পারব না সেটা জানি। কিন্তু লোকটাকে জানার একটা চেষ্টা ছেলে হিসেবে আমার করা উচিত ছিল। আমি তো ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি ছেড়ে এসে পার্টি অফিসেই থাকব। হোল টাইমার হিসেবে। ওসব ব্যবসা বাণিজ্য বিষয় সম্পত্তির কচকচি আমার আর ভাল লাগে না।

এ কথায় অরুণদা যে খুব উৎসাহিত হল তা নয়। বরং চিন্তিত ভাবে বলল, ঠিক করে ফেলেছিস? খুব ভাল। হোল টাইমার হওয়ার ইচ্ছে হলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। কিন্তু কি জানিস, তুই পার্টির হোল টাইমার হলে পার্টির কতটুকু লাভ হবে? একটা কর্মী বাড়বে বড় জোর। তার বেশি নয়। কিন্তু তুই যদি ফ্যামিলি বিজনেসে নেমে কিছু করতে

পারিস তাহলে পার্টিকে যোগান দিতে পারতিস। তাতে পার্টির অনেক বেশি উপকার হবে। বেকারের দেশে হোল টাইমারের অভাব হয় না, কিন্তু যোগানদারের অভাব হয়। পার্টির কাজ তো ব্যবসা বাণিজ্য রুজি

উঠে এল। চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, রতন বলল, ঘটির জলে হাতটা ভাল করে ধুয়ে এসো বারান্দা থেকে। চলো, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি।

বাধ্য ছেলের মতোই অভিরাম হাত ধুয়ে এল এবং খেতে বসল।

রতন নিজের ঘরের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে দেখল, বাবা খাচ্ছে। গোগ্রাসে নয় কিন্তু তৃপ্তির সঙ্গেই খাচ্ছে। শেষে দুধটাও চুমুক দিয়ে সবটা খেয়ে নিল।

রতন ফের ঘটি নিয়ে বারান্দায় জল ঢেলে দিল অভিরামের হাতে। আঁচানোর পর বলল, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো।

অভিরাম দ্বিরুক্তি না করে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই তার নাক ডাকতে লাগল। আজও বাবাকে কাঁথা দিয়ে ঢেকেঢুকে দিল রতন। চৌদ্দ বছর পর সে আজই প্রথম অনুভব করল, অভিরাম তাকে মূল্য দিচ্ছে। তার কথা শুনছে, মেনে নিচ্ছে। সে ধমক দিলে সংযত হয়ে যাচ্ছে। কেন? বই রেখে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল রতন। কেন তাকে সমীহ করছে লোকটা? তার বাবা কি এখন বশীভূত হতে চাইছে তার? এ কি একটা মানসিক আশ্রয়ের জন্য বাচালপনা? বাবা কি এখন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে মূল্য দিচ্ছে?

পরদিন সে অরুণদাকে নিরিবিলিতে জিজ্ঞেস করল, অরুণদা, আপনি তো আমার বাবাকে চিনতেন!

চিনতাম মানে? এখনও চিনি, ছেলেবেলা থেকেই চিনি। অভিরামদা পার্টির সিমপ্যাথাইজার ছিলেন। মোটা চাঁদাও দিতেন। অবশ্য প্রভাবশালী লোকেরা কাজ কারবারের সুবিধের জন্য পার্টিকে হাতে রাখতে চায়। নতুন কিছু নয়।

আমি শুনেছি, বাবা খুব সাহসী লোক ছিলেন।

খুব সাহসী। তেরো চৌদ্দ বছর আগে আমরা তো ছোকরা ছিলাম, অভিরামদাকে খুব ভয় পেতাম মনে আছে। ভীষণ পারসোনালিটি ছিল।

আপনি কি জানেন যে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা মার খাচ্ছে! কারবার গুটিয়ে ফেলা হবে!

ব্যবসা বাণিজ্যের খবর অত জানি না। তবে তোদের যে আর সেই রোজগার বজায় রেখেও করা যায়। ফাঁকে ফাঁকে এসে দলের কাজ করবি, মিটিঙে বক্তৃতা দিবি। তাতে কোনও অসুবিধে হবে না।

তাহলে আপনি আমাকে ডিসকারেজ করছেন?

তাও করছি না। কথাগুলো একটু ভেবে দেখ। ভাল করে বুঝে শুনে তারপর যা হয় করিস। নিজের উপায় থাকতে পার্টির গলগ্রহ হবি কেন?

আসলে আমি বাড়ি ছাড়তেও চাইছিলাম।

ছাড়বি কেন? অসুবিধের কী আছে? অত বড় বাড়ি তোদের, কত নাম ডাকের বাড়ি। ও বাড়ি ছাড়তে আছে? তুই বুদ্ধিমান ছেলে, ভাল করে ভেবে দেখ।

এ কথায় একটু দমে গেলেও রতনের মন খুব খারাপ হল না। কারণ, কাকা, জ্যাঠা, খুড়িমা, জ্যেঠিমা এদের একটা টানও তো আছে। মা চলে গেছে বলেই তাকে যেন একটু বেশি বেশি আগলায় সকলে। বাড়ি ছাড়ার কথা ভাবলে এমনিতেই মন খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর কাল রাতে বাবার ওই খাওয়ার দৃশ্যটাও তাকে খানিকটা দুর্বল করে ফেলেছে। সে চলে এলে বাবা ফের ওরকম না খেয়ে শুয়ে থাকবে।

সাইকেল নিয়ে গোটা শহরটা চক্কর দিতে দিতে সে ভাবছিল। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় সে বাজারের তেমাথা থেকে ডাইনে বাঁক নিয়ে তাদের দড়ির দোকানটার কাছে এসে নামল। এই দোকানেই বাবা ভিতর দিকে সারাদিন চুপ করে বসে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য আর কিছুই দেখে না। শুধু বসে থেকে সময় কাটিয়ে দেয়।

সে ভিতরে ঢুকল। চারদিকে দড়ি আর দড়ি। দড়ির রাজ্য। বাইরে কয়েকটা টেম্পো দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে দু-তিনজন খদ্দের।

দোকানের পিছনদিকে বড় ঘরখানা আসলে গুদামঘরের মতোই। মালপত্রে ঠাসা। গোছা গোছা দড়ি ঝুলছে, সারি সারি লোহার র‍্যাকে দড়ির গুছি ঠাসা। তারই মাঝখানে একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছে বাবা। পাশেই জানালা, জানালার ওপাশে কচুবন, একটা এঁদো পুকুর। আঁশটে গন্ধ আসছে। অভিরাম তার মধ্যেই চোখ বুজে বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

বাবা!

অভিরাম এক ডাকেই চোখ মেলল। সামনে রতনকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলল, কী বলছিস?

বলছি, তোমার কি মদ না খেলেই চলে না?

অভিরাম যেন একটু লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল, জবাব দিল না।

রতন বলল, একটা কথা বলছিলাম। ভেবে দেখো, মদ যদি নিতান্তই খেতে হয় তাহলে বাইরে না খেয়ে ঘরে বসে খেলেই তো পারো। তাতে সিন ক্রিয়েট করতে হয় না।

অভিরাম চুপ করে রইল।

তোমার শরীরও ভেঙে যাচ্ছে। একটু ভেবে দেখতে বলছি।

এইটুকু বলেই রতন বেরিয়ে এল।

দুপুরে সে জ্যাঠামশাইকে গিয়ে বলল, আমি যদি একটা মোটরবাইক কিনতে চাই তাহলে কি তোমাদের আপত্তি হবে?

জ্যাঠা অবাক হয়ে বলল, আপত্তি? আপত্তি হবে কেন? তোর বাবার তো একটা ছিল, এক সময় খুব দাবড়ে বেড়িয়েছে। বেচেবুচে দিয়েছে

করেই, তা কেন না, আমাদের তো লাগে না, গাঁয়ের মধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্য, সাইকেলেই হয়ে যায়। তোর কাঁচা বয়স একটু ঘুরে টুরে বেড়াবি।

অনুমতি দিচ্ছ তাহলে?

হ্যাঁ রে, তোদের টাকার অংশ তো জমেই যাচ্ছে, কালই সদরে বিপুলের দোকানে চলে যা। ভাল দেখে একটা নিয়ে আয়। বিলটা পাঠিয়ে দিতে বলিস, দাম মিটিয়ে দেব।

কালকেই যাব সকালে।

পাঁজিটা দেখে যাস। বাহন ক্রয়ের যোগ আছে কিনা দেখে যাওয়া ভাল। আচ্ছা ও আমিই দেখে রাখবখন।

বেরিয়ে আসার সময় শুনতে পেল জ্যাঠাইমা বলছে, ঠাকুর! ঠাকুর! মোটরসাইকেল যখন কিনতে চাইছে তখন মতিগতি ফিরেছে বোধহয়। ঠাকুরকে কত ডাকছি সেই থেকে।

রতন একটু হাসল আপন মনে।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে আজও সে রবিনসন ক্রুসো পড়ছিল, তন্ময় হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে শুনল, আগর ঠেলে কে যেন ঢুকল। এত রাতে তো শুধু বাবাই ফেরে। আর তো কেউ নয়! স্বাভাবিক পায়ের শব্দ, মুখে কোনও গালমন্দ, শাপ শাপান্ত নেই। এ ত বাবা নয়!

কিন্তু বাবাই। অভিরাম পাশের ঘরে এসে ঢুকল। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিল রতন, তার বাবা বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি বা ধুতি কিছু একটা পরল। তারপর উঠোনে গিয়ে বালতির জলে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এল। নিঃশব্দে খেতে বসল।

রতন উঠে দু-ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে চেয়ে দেখল, বাবা চুপচাপ একা বসে খাচ্ছে। দেখতে দেখতে তার চোখ ভরে জল এল। চুপ করে, একা, নিঃসঙ্গ বসে ওই খাওয়ার দৃশ্যের মতো এমন হৃদয়বিদারক যেন কিছু নেই আর। আজ মদ খায়নি বাবা। রতনের কথা শুনেছে।

রতন বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। অরুণদা বলেছিল দেবদাস। কথাটা কি মিথ্যে? চৌদ্দ বছর কেন লাগল রতনের এই কথাটা বুঝতে? চৌদ্দ বছরে যে অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে লোকটা। ক্ষয় হয়েছে পৃথিবী।

ছয়

বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্যের মুশকিল হল, সে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। একসময়ে টোলে পড়েছে। তারপর সংস্কৃত কলেজে। পাঠবাড়িতে ভাগবত পড়তে গেছে। কাশীতেও কিছুদিন। ফলে সে শাস্ত্রের জাহাজ। বিদ্যা বিক্রয় করা

বিহিত নয় বিবেচনায় অধ্যাপনা বা চাকরিও করেনি। উপরন্তু তার ঠাকুর্দা পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করতে নিষেধ করে যাওয়ায় সে আটকে পড়েছে গ্রামে। শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার ফলে সবাই তাকে একটু ভয় পায়। ছোটোখাটো পুজো পার্বণে পৌরোহিত্যে কেউ তাকে ডাকে না। কারণ, উপচারে গণ্ডগোল দেখলে সে ভারী রেগে যায়। বিধান নিতে কেউ কেউ আসে বটে, কিন্তু বিধান শুনে পালানোর পথ পায় না। সাধারণ পুজারি পুরুতরা মূল্য ধরে দিলেই সব ত্রুটি বিচ্যুতি ঢেকে নেন, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের কাছে পার পাওয়ার জো নেই। ফলে সে জমিজমার বিলিব্যবস্থা নিয়েই থাকে। অবসর সময়ে শাস্ত্রপাঠ। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন বা পুজো পার্বণে তার বিশেষ ডাক পড়ে না।

সকালবেলায় তার কাছেই হাজির হল মহেন্দ্র।

ঠাকুরমশাই, আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। একটু যোটক বিচার করতে আসা।

তুমি কে?

আজ্ঞে, পাশের গাঁ গোপালগঞ্জে থাকি। মহেন্দ্র বিশ্বাস।

যোটক বিচার করিয়ে কী হবে? বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেছে বললে! ঠিক হয়ে গিয়ে থাকলে যোটক বিচার করাতে যাবে কেন?

আজ্ঞে, ঠিক তো হয়েই গিয়েছিল, তবে ওই নিয়ে মেয়ের মা একটু ফ্যাকড়া তুলেছে। ভাল পণ্ডিত দিয়ে যোটক বিচার করাতে চায়। তল্লাটে আপনার ওপরে তো কেউ নেই।

বিল্বমঙ্গল হেসে বলল, কুষ্ঠি যদি না মেলে তখন কী করবে? আমাকে শাপ শাপান্ত করবে তো।

জিব কেটে মহেন্দ্র বলে, না না, সে কী কথা!

তুমি হলে মেয়ের বাপ। মেয়ে পার করতে পারলেই হল। সুযোগ ফসকালে রাগ তো হতেই পারে।

আজ্ঞে না। মেয়ে আমার গলগ্রহ নয়। আদরেরই মেয়ে। যোটক না মিললে পিছিয়ে আসব।

ভাল। কিন্তু শুধু কোষ্ঠী দেখলেই তো হবে না। তার আগে কিছু কথা আছে।

কী কথা ঠাকুরমশাই?

বলি গৌরীদান করছ না তো।

কথাটা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মহেন্দ্র।

বিল্বমঙ্গল হেসে বলল, বলি মেয়ের রজোদর্শন হয়েছে? না হয়ে থাকলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মহা পাপ। আগেকার দিনে হেটো মেটো পুরুত আর টুলো পণ্ডিতেরা দুধের বাচ্চা মেয়েগুলোর বিয়ের বিধান দিয়ে দেশটা বালবিধবায় ভরে ফেলেছিল। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।

বেশি বিদ্যাও যে ভয়ংকর সেটা মহেন্দ্র হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল।

কারণ সে রজোদর্শন কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না। কাজেই আমতা আমতা করতে লাগল।

বিল্বমঙ্গল বোধহয় মহেন্দ্রর অসুবিধেটা অনুমান করেই জিজ্ঞেস করল, মেয়ের বয়স কত?

পনেরো পুরে ষোলোয় পা দিয়েছে।

তাহলে তো ঠিকই আছে। আরও একটা কথা।

সভয়ে মহেন্দ্র বলল, আজ্ঞে বলুন।

এ বিয়েতে মেয়ের পূর্ণ সম্মতি আছে তো!

যে আজ্ঞে! মেয়েকেও সঙ্গে এনেছি। সে ওই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ভারী লজ্জা। নিয়ে আসব?

আনো।

হাতটা একটু দেখে দেবেন কি?

আমি হাতটাত দেখি না। লক্ষণ দেখি। নিয়ে এসো।

একটু বাদে মহেন্দ্রর পিছু পিছু যে কৃশকায় মেয়েটি তার সামনে এসে নতমুখে দাঁড়াল তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বিল্বমঙ্গল। ভারী সুশ্রী, ভারী সুলক্ষণা। দু'জনে ভারী জড়োসড়ো হয়ে সামনের মাদুরে বসল।

বিল্বমঙ্গল মেয়েটিকে আরও একটু লক্ষ করার পর বলল, তোমার মেয়ে অতি সুলক্ষণা। এর যেখানে সেখানে বিয়ে দিও না। ভাল ঘরে দিও।

আজ্ঞে, বেজায় ভাল ঘর ঠাকুরমশাই। টাকা-পয়সার লেখাজোখা নেই।

টাকা থাকলেই কি ভাল হয়? ও বুদ্ধি ভাল নয় হে।

মাথা চুলকে মহেন্দ্র বলল, একটু খিঁচও আছে ঠাকুরমশাই। সেই জন্যই মেয়ের মা একটু খুঁতখুঁত করছে। পাত্রের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সেই বউ বিয়ের পর পরই গলায় দড়ি দিয়েছে।

বিল্বমঙ্গল স্থির দৃষ্টিতে মহেন্দ্রর দিকে চেয়েছিল। বলল, গলায় দড়ি দিল কেন খোঁজ নিয়েছ?

নিয়েছি। মেয়েটারই গণ্ডগোল ছিল। বিয়ের আগে কোন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তারই জের।

কার কাছে শুনেছ?

সবাই জানে কিনা!

একতরফা শুনে বিচার করা ঠিক নয়। ভাল করে খোঁজ নাও। দুগ্ধে মক্ষিবৎ আরও কিছু থাকতে পারে। তোমার মেয়ের মুখ অত বিষণ্ণ কেন?

আজ্ঞে রোদে দেড় মাইল পথ হেঁটে এসেছে তো! তাই।

মেয়ের অনিচ্ছে বুঝলে বিয়েটা কিন্তু দিও না। কোষ্ঠী আমি দেখে

রাখবখন। কাল এসো।

হৈমন্তী তার দুটি আয়ত ছলছলে চোখ তুলে একটু তাকিয়ে রইল বিল্বমঙ্গলের দিকে। সেই চোখে বিল্বমঙ্গল যা দেখার দেখে নিল। পায়ের ধুলো নিয়ে উঠল দু'জনে।

মাঠের ভিতর দিয়ে আলপথে বাপের পিছু পিছু ছাতা মাথায় হেঁটে যাচ্ছিল হৈমন্তী। মনটা ভার। তবে বেলঠাকুর মত দেয়নি এটুকুই যা ভাল। বেলঠাকুরকে সবাই ভারি ভক্তিশ্রদ্ধা করে, ভয়ও পায়। যা বলে তাই নাকি ফলে যায়।

আজকাল সতীশ ব্রহ্মর যাতায়াত বেড়েছে। প্রায়ই হুটহাট চলে আসছে তাদের বাড়িতে। প্রথম দিন এসে বলল, ওরে, তোরা তো মন্তর করেছিস দেখছি। কী সুখ্যাতিই করল সবাই; পঞ্চমুখে প্রশংসা। ছেলেও দেখলাম কেত্‌রে পড়েছে। তোর মেয়ের কপালটা বড্ড ভাল রে মহিন্দির। তাহলে আর দেরি কেন, আশীর্বাদটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে দেগে রাখ। অঘ্রান চলছে, পৌষে বিয়ে নেই, সেই মাঘ।

লবঙ্গ মিষ্টি করেই বলল, অত তাড়া কিসের কাকা? মাঘের পর ফাল্গুন আছে! যোটক বিচারই তো এখনও হয়নি।

সতীশ ব্রহ্ম এ কথাটায় খুশি হল না। বলল, তা করাবে করাও। তবে ওসব আজকাল আর কে মানছে বল! এমন পাত্র কি আর পাবে? বেশি ফ্যাঁকড়া তুললে আবার কেঁচে না যায়।

তিন দিন বাদেই সতীশ ব্রহ্ম পাত্রের কোষ্ঠীর জেরক্স কপি নিয়ে এল। বলল, তারা তো উদ্যোগ আয়োজন করতে লেগেছে দেখলাম। ভারা বেঁধে বাড়ি রং করানোর তোড়জোড় হচ্ছে। বাথরুমের পুরনো মেঝে ভেঙে মার্বেল বসাচ্ছে। লাখো টাকার ধাক্কা। বেনারসির অর্ডার গেছে খোদ কাশীতে।

সবই শুনল হৈমন্তী। তার বুক আরও শুকিয়ে গেল। রত্না নামে যে বউটি এসেছিল সে যাওয়ার সময় হঠাৎ ফিরে এসে তাকে আলাদা করে যে কথাটা বলে গেল সেটা সে মাকে বলে দিয়েছিল—

শুনে লবঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলল, আর কিছু বুঝলি?

না। শুধু বলল যেন ইচ্ছে না হলে বিয়ে না করি। শক্ত থাকতে বলল।

সে তো ওদেরই লোক। অমন কথা বলল কেন?

তা তো জানি না।

মেয়েটাকে দেখে তো কুচুটে বলে মনে হয় না।

হ্যাঁ মা, বেশ মানুষ তো!

লবঙ্গ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই লবঙ্গ একটু রাশ টানার চেষ্টা করছে। এটাও হিমির একটু ভরসা। কিন্তু বাবাকে নিয়েই মুশকিল। তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করে যাওয়ার পর বাবা প্রায়ই সদরে

গিয়ে পাত্রের বাড়ি হানা দিচ্ছে। ফিরে এসে সোৎসাহে নানা কাহিনী শোনাচ্ছে। আসবাবপত্র, গয়নাগাঁটি সবই নাকি তাকে দেখাচ্ছে তারা। খাওয়াচ্ছেও খুব। পাত্রের নাকি খুব আগ্রহ দেখা দিয়েছে বিয়েতে। ভাবী শ্বশুরমশাইকে গাড়ি করে শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। একদিন গাড়ি করে বাড়ি অবধি এগিয়েও দিয়ে গেছে। তাতেই মাথা ঘুরে গেছে মহেন্দ্রর। এখন সে বরপক্ষের হয়েই জোর সওয়াল করছে।

আজ বেলঠাকুরের বাড়ি থেকে ফিরেই হৈমন্তী দেখল, সতীশ ব্রহ্ম বাইরের ঘরে বসা। পাশে মস্ত মিষ্টির হাঁড়ি।

কোথায় গিয়েছিলে মহিন্দির, বেলঠাকুরের কাছে নাকি?

হ্যাঁ, কাকা, যোটক বিচারটা করতে দিয়ে এলুম।

তা বেলঠাকুর কেন? দেশে কি আর পণ্ডিত নেই?

তা থাকবে না কেন? তবে বেলঠাকুরের নাম বেশি।

আরে ও তো নারদমুনি। শাস্তর জানে না তা বলছি না। তবে তিলকে ফাঁপিয়ে তাল করার গোঁসাই। খুঁটে খুঁটে কেবল এ দোষ সে দোষ বের করবে। সেই জন্যই তো ওর কাছে কেউ যায় না। তা কী বলল টলল?

ও একরকম মতই দিয়েছে ধরতে পারেন। তবে বলেছে মেয়ে খুব সুলক্ষণা, যেন ভাল ঘরে যায়।

আহা, সেটা আবার নতুন কথা কী? তোর মেয়ে যে লক্ষ্মীমন্ত সে কি আর আমরাও বলিনি! যাকগে যাক। কোষ্ঠীর জেরক্স কপি দিয়ে এসেছিস তো!

হ্যাঁ। আজকাল সবাই তাই তো দেয়।

তাহলে আর বেলঠাকুরের কাছে গিয়ে কাজ নেই। হাজার টাকা চেয়ে বসবেখন। তোর তো আর টাকা শস্তা হয়নি। সামনেই মেয়ের বিয়ে, তার কিছু খরচাপাতি তো আছেই। এখন হাতে টাকা রাখতে হয়। এই যে তারা ভাল কারিগর দিয়ে সরভাজা তৈরি করে পাঠিয়েছে।

সরভাজা! উরেব্বাস রে!

আর টাকা-পয়সার কথা যখন উঠলই তখন একটা কথা তোকে বলে যাই।

কী কথা কাকা?

পাঁচ কান করার দরকার নেই।

আরে না, কে পাঁচকান করতে যাচ্ছে?

ছেলে আমাকে গোপনে বলেছে, তোকে বিয়ের খরচের কথা ভাবতে হবে না।

কেন?

খরচ যা হবে তা ছেলে নিজেই তোকে আগাম পাঠিয়ে দেবে। লোকে বরপণ দেয়, তোর বেলায় দেখছি উল্টোটাই হচ্ছে। ঘরদোর

সারাতে মিস্তিরি লাগিয়ে দে বরং। কাজ এগিয়ে থাক।

ভারী লজ্জা পেয়ে মহেন্দ্র বলল, এটা বোধহয় ঠিক হবে না কাকা। আমি কি তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে পারি?

দোষের কি? শেষ অবধি তো মেয়েই সব পাবে তোর।

তাহলেও একটা আত্মসম্মান বলে কথা আছে।

রেখে দে তোর আত্মসম্মান। এ বাজারে ওসব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি? তার তো টাকায় ছাতা পড়ছে।

ভেবে দেখি কাকা। লবঙ্গেরও একটা মতামত আছে। শুধু আমি মত দিলেই তো হবে না।

কথাটা হচ্ছিল হিমির সামনেই। ব্রহ্মদাদু বোধহয় তাকে শুনিয়েই বলল কথাটা। বলে একটু তাকালও তার দিকে। মুখে তৃপ্তির হাসি।

কিন্তু হিমির আনন্দ হচ্ছে না। অপমান লাগছে। তার বাবা একটু বোকাসোকা মানুষ, মান অপমান জ্ঞান অত টনটনে নয়। একটু চাপাচাপি করলেই বাবা হয়তো ওদের টাকা নিতে রাজি হয়ে যাবে।

লবঙ্গ মেয়ের কাছে সব শুনে অবাক হয়ে বলল, টাকা দিতে চাইছে? এটা তো ভাল কথা নয়। আমরা গরিব বটে, কিন্তু বিয়ের খরচ ওরা দিতে চায় কোন সাহসে? তোর বাবা রাজি হয়েছে নাকি?

না। তবে বেশি জোর করছে না। ব্রহ্মদাদু টাকাটা নিয়ে নিতে বলছে। ওতে নাকি দোষ হয় না।

সতীশকাকার ব্যাপারটাও বুঝতে পারছি না। হঠাৎ যে কেন পাত্রপক্ষের হয়ে এত হাঁটাহাঁটি করতে লেগেছে, আমরা তো অমত করিনি। তা হলে অমন ল্যাংলাচ্ছে কেন?

হিমি কোনও দিনই মতামত দেয় না। এখনও চুপ করে রইল।

লবঙ্গ অনেকক্ষণ ভেবে বলল, আমার যেন কেন ভাল লাগছে না। রত্না নামে যে মেয়েটা এসেছিল ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে হত। মেয়েটার মুখে একটা ভাল মানুষের ছাপ আছে। পাশেই থাকে, জানে অনেক কিছু, হয়তো আগের বউটাকেও চিনত।

এসব লবঙ্গর আত্মকথন। হিমিকে বলা হচ্ছে না। হিমি তাই চুপচাপ শুনে গেল। মানুষ যখন সমস্যায় পড়ে তখন অনেক সময় অন্যকে সাক্ষী রেখে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে। এও হচ্ছে তাই।

রাত্রিবেলা লবঙ্গ মহেন্দ্রকে বলল, শোনো, কাল আমি একবার তোমার সঙ্গে সদরে যাব। আমার দরকার আছে।

মহেন্দ্র খুশি হয়ে বলল, যাবে? খুব ভাল হবে। ওঃ! বাড়িঘর দেখলে মাথা ঘুরে যাবে তোমার। কী ডেকোরেশন! সব যেন ঝাঁ চকচক করছে। হবে নাই বা কেন, দশ বিশটা বোধহয় কাজের লোকই আছে। তুমি গেলে তো সবাই একেবারে মাথায় তুলে নেবে। আমি গেলেই হুলুস্থুলু পড়ে যায়।

লবঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, কেন বলো তো, তুমি গেলে ওদের এত আহ্লাদের কী? তুমি মেয়ের বাপ বৈ তো নও।

আহা তারা বিশেষ সজ্জন মানুষ। শিক্ষাদীক্ষাও আলাদা রকমের। সহবত জানে।

কিন্তু বাড়াবাড়ি কি ভাল?

কেন, বাড়াবাড়িটা কী দেখলে?

তুমি তো শিবঠাকুরটি, খাতির যত্ন পেয়েই বুঁদ হয়ে যাও। কিন্তু খাতির যত্ন কেন করা হচ্ছে তা তলিয়ে দেখ না।

ও কথা কেন বলছ? তারা তো ভাল লোক।

আমি মন্দ বলিনি। বলেছি তারা হয়তো খুবই ভাল। কিন্তু আমার কতগুলো জিনিস বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

কী বলো তো?

তুমি এত ঘন ঘন ও বাড়িতে যাচ্ছ কেন?

কী করব বলো। যতবার যাই ততবারই পই পই করে বলে দেয় যখনই সদরে কাজ থাকবে তখনই একবারটি করে পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন।

এদেশে কবে থেকে মেয়ের বাপের এত কদর হল বলতে পারো?

তুমি যে ভারী অবাক করে দিচ্ছ আমায়! তবে কি দূরছাই করলে ভাল হত?

না, তা হত না। এত অল্প দিনের চেনায় তোমাকে তারা এত আপন করে নিচ্ছে কেন ভেবে দেখেছ?

নেবে না! দুদিন পর কুটুম্বিতা হচ্ছে যে! হয়েই গেছে একরকম।

এই যে তুমি ও বাড়িতে এত যাচ্ছ, তারা কি কখনও আগের বউয়ের কথা কিছু বলেটলে?

আরে না না। সেই মেয়েটা তো এদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে গেছে। তার কথা বলতে যাবে কেন, পাগল নাকি?

পাড়া-প্রতিবেশীদের কজনের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ করেছ বলো তো!

দু-তিনজনের কাছে। আরে সে একটা বাজে মেয়ে। লাভারটা চুপি চুপি দেখা করতে আসত। ধরা পড়ে পাড়ার লোকের হাতে মারও খায়।

তবু সব কথা পরিষ্কার হচ্ছে না। আমাদের উচিত ওই মেয়েটার বাপের বাড়িতে গিয়ে একটু শুনে আসা।

মহেন্দ্র বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, শুনিনি ভেবেছ? সতীশকাকা নিজেই গরজ করে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। তারাও স্বীকার করেছে, মেয়েরই দোষ ছিল।

বলেছে?

বলবে না? মেয়ের দাদা আরও বলেছে, ছেলের আবার বিয়ে হচ্ছে

বুঝি? ভাল, ছেলে খুব ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

তার মানে কি?

মানে বুঝলে না? ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে গুরুতর মানুষ, কাজের লোক, সবাই মানেটানে। ভি আই পি আর কি।

তবু তোমারও একবার নিজে যাওয়া উচিত।

আহা, সতীশকাকা কি আর মিছে বলবে? তার একটা দায়িত্ব নেই?

তা বলছি না। তবু পরের মুখে ঝাল খাওয়ার দরকার কী? তার বাপের বাড়ি কি দূরে কোথাও?

খুব কিছু নয়। পাশেই বাঁকড়ো জেলায়। গ্রামের নামটা মনে নেই, তবে ঠিকানাটা লেখা আছে। বউয়ের বাপের বাড়ির ঠিকানা কিন্তু বিমানই দিয়েছে, বুঝলে!

কাল আমাকে সদরে পৌঁছে দিয়ে তুমি বাঁকড়োয় ওই গ্রামে চলে যাও। খোঁজ নিয়ে এসো, আমি একা ফিরতে পারব।

কালই?

হ্যাঁ। দেরি করা ঠিক নয়। আশীর্বাদের জন্য কেমন ঝোলাঝুলি করছে দেখছ না? ওসব হওয়ার আগেই খোঁজখবর সেরে রাখা ভাল। সদর থেকে তো বাঁকড়োর বাস ছাড়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশি দূরেও নয়। সতীশকাকা তো বলছিল, দু ঘণ্টার রাস্তা।

তা হলে তো কাছেই।

হ্যাঁ। তোমাকে ও বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়বখন।

লবঙ্গ বলল, ও বাড়িতে! আমি ও বাড়িতে যাব না তো।

তা হলে কোথায় যাবে?

আমার অন্য কাজ আছে।

সে কী? তুমি কি ওখানকার রাস্তাঘাট চেনো? চিরকাল গাঁয়ে পড়ে রইলে।

সে আমি চিনে নেব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

কী আবার মতলব আঁটছ কে জানে! তা যাবেটা কোথায়?

সে আমার চেনা লোক আছে।

আমাকেও বলবে না নাকি?

বলব, তবে ঘুরে এসে।

তা হলে আমি একাই একটু বেয়ানের সঙ্গে দেখা করে যাব।

লবঙ্গ দৃঢ় স্বরে বলল, না, তুমিও যাবে না।

ভারী হতাশ হয়ে মহেন্দ্র বলে, যাব না?

না। ও বাড়িতে যাতায়াত এবার বন্ধ করতে হবে। ভাল দেখাচ্ছে না।

কী এমন হল গো? মেয়ের বিয়েটা বেশ বেঁধে ফেলেছিলাম, হঠাৎ কেন যে নানা বাধক আসছে কে জানে বাবা। বেলঠাকুরও যেন কেমন

আড় হয়ে আছেন। তুমিও যেন তেমন খুশি নও। এমন রত্ন ছেলে আর পাওয়া যাবে?

আমার তো অমত নেই। তবে হুট করে মেয়েকে বিদেয় করতে পারব না। আগে খোঁজখবর নিই।

খোঁজখবর তো আমি আর সতীশকাকা কম নিলুম না। তুমি মেয়েমানুষ আর কী খোঁজখবর নেবে বলো তো?

আমারও কিছু জানবার থাকতে পারে তো। মেয়েমানুষদেরও কিছু মেয়েলি ব্যাপার থাকে। ওসব নিয়ে তুমি ভাবতে বোসো না। বিয়েতে আমি অরাজি নই, কিন্তু ঢলেও পড়ছি না।

চুপ করে শুয়েছিল লবঙ্গ। তার ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে টের পেল পাশে মহেন্দ্রও বড্ড এ-পাশ ও-পাশ করছে। তারও ঘুম আসছে না। বড় বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ছে মাঝে মাঝে। বড্ড মায়া হল লবঙ্গর। লোকটা লোভানিতে পড়ে গেছে। পড়ার কথাই। অত বড়লোক, অত ঐশ্বর্য, অত খাতির যত্ন। লোভানিতে কি লবঙ্গও পড়েনি? তারও তো ইচ্ছে করছে ছোটোখাটো প্রশ্নগুলো চাপা দিয়ে বিয়েটা দিয়েই দেয়। কিন্তু ওইসব ছোট ছোট প্রশ্নগুলো কুটকুট করে কামড়াচ্ছে তাকে অহরহ। তার ছেলেমানুষ সরল মেয়েটা যদি জলে গিয়ে পড়ে তা হলে লবঙ্গ কি বাঁচবে?

পাশের ঘরে জেগেছিল হৈমন্তীও। পাশেই সেবন্তী অঘোর ঘুমে। সে পাশবালিশ আঁকড়ে কাত হয়ে ঝিম মেরে চোখ বুজে আছে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। তার চোখের পাতায় আজ ঘুমের আঠা লাগছে না। চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে ঘুম। মন ভাল নেই। তার মন ভাল নেই।

সকালে মা বাবা মিলে কোথায় গেল কে জানে। শুধু বলে গেল, আমাদের ফিরতে সন্ধে হবে। তোরা যা হোক রেঁধেবেড়ে খেয়ে নিস।

একটা শূন্যতার মধ্যে হিমির দিনটা কেটে গেল। তার মধ্যেই কলের পুতুলের মতো ঘরের কাজকর্ম করে গেল সে। রাঁধল বাড়ল, ঘর গোছাল, ঠাকুরকে জলবাতাসা ফুল দিল। সারাক্ষণ বুকে দুরু দুরু, গলা শুকনো, চোখে জল আসে। বেলঠাকুর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার মেয়ের মুখ এত বিষণ্ণ কেন? বেলঠাকুর কি অন্তর্যামী? হলে খুব ভাল হয়। কেউ যদি তার মনটা দেখতে পেত!

সন্ধেবেলা প্রথমে ফিরে এল বাবা। মুখখানা গম্ভীর। হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে বসে রইল। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, তোর মা আসেনি? রাস্তাটাস্তা হারিয়ে ফেলল কি না কে জানে?

লবঙ্গ ফিরল আর একটু বাদে। তারও মুখখানা গম্ভীর। ঢুকেই বলল, কী গো! শুনে এলে কিছু?

হ্যাঁ। সবই ভাল। তবে কথাটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, ইমপোটেন্ট। মেয়ের দাদাই বলল।

তার মানে কী?

যাদের পুরুষত্ব থাকে না তাদের নাকি ইংরেজিতে ওই বলে। তবে ওদের কথায় বিশ্বাস কী? ছেলের ওপর খার আছে বলেই বলছে বোধহয়। আমি তো বিশ্বাস করিনি। ভাবছি কালই সদরে গিয়ে একেবারে বাবাজীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করে আসব।

এই না হলে বুদ্ধি।

তা হলে?

ও বাড়িতে তোমাকে আর যেতে হবে না।

উড়ো কথায় বিশ্বাস করে সুযোগটা হাতছাড়া করবে?

হাতছাড়া তো এখনও হয়নি। একটু রোসো।

তুমিই বা কী জেনে এলে?

পরে বলব।

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, এসব আমার মোটেই ভাল লাগছে না। দিব্যি গড় গড় করে এগোচ্ছিল, হঠাৎ ব্রেক মেরে বসছে যে!

সাত

গোপালপুরে কৃষকসভা ছিল দুপুরবেলায়। সন্ধের মুখে শেষ হল। এখানে সন্ধের পর আর মিটিং হয় না। আলোর ব্যবস্থা নেই। প্রান্তিক চাষিদের বাস। কদিন আগেই এখানে একটা রাজনৈতিক হামলা হয়ে গেছে। দু-তিনটে ঘর পুড়েছে, মারধর হয়েছে। মিটিংটা ছিল দলের শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনে। ম্যাটাডর, ভ্যানরিক্সা, গরুরগাড়িতে বিস্তর লোক আনা হয়েছিল আশপাশ থেকে। সাইকেলই এসেছে শ দুয়েক। "আমি ভয় করব না, ভয় করব না..." গানও হয়েছে সমবেত কণ্ঠে। মিটিং সফল।

একটা মিটিং সফল হল কি না সেটা বোঝা যায় শ্রোতার নিবিষ্টতায়, প্রতিক্রিয়ায়, শ্লোগানের আওয়াজে এবং মিটিঙের শেষে টুকরো টাকরা মন্তব্য আর আলোচনায়। এগুলো রতন আজকাল খুব বুঝতে পারে। বিশেষ করে কোনও হামলা হয়ে গেলে তার পরের মিটিংটা সফল হয়েই থাকে। মানুষ তো নিজের পার্টির কাছে নিরাপত্তাই খোঁজে। মাঠ আজ ভরে গিয়েছিল লোকে আর ঝান্ডায়।

মিটিঙের পর গাঁয়ের অতিথিবৎসল লোকেরা একটু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। চা, মুড়ি, নারকোল বা যা হোক কিছু। আড্ডাও হয়। কিন্তু রতনের আজ তাড়া আছে। আজকাল তার তাড়া থাকে। ঘুরে ফিরে দুটো দোকানে বসছে সে। কাকা জ্যাঠাদের মুখে চওড়া হাসি ফুটেছে আজকাল। আর আশ্চর্যের বিষয় তার বাবা গত এক মাসের ওপর হয়ে গেল মদ খায়নি। চুপচাপ রাতের দিকে বাড়ি ফিরে আসে।

আজকাল আর ঢাকা ভাত খেতে হয় না। ফিরতে বেশি রাত হয় না বলে ভাইদের সঙ্গে বসেই খায়। তবে রাতে বাবার যে ভাল ঘুম হয় না সেটা পাশের ঘর থেকে খুব টের পায় রতন। ঘুম না হওয়ারই কথা। চৌদ্দ বছরের নেশা ছাড়লে শরীর তা কি সহজে মানতে চায়? বাবার সঙ্গে যে তার ভাবসাব হয়ে গেছে তাও নয়। বাধো-বাধো ভাব একটু এখনও আছে। তার এক কথাতেই যে বাবা মদ ছাড়বে এতটা আশা করেনি রতন। কাজেই সেও একটু ধন্ধে পড়ে গেছে। বাবা তাকে এতটা সমীহই বা করছে কেন? সে কি সত্যিই আশ্রয়ের খোঁজে?

ঝান্ডা লাগানো নিজের ঝকঝকে মোটরবাইকটায় স্টার্ট দিতে গিয়ে রতন কি ভেবে একবার চারদিকে চাইল। এখানে ওখানে মানুষের জটলা। মিটিং ভাঙলে যে-রকমটা হয় আর কি। যাই-যাচ্ছি করেও কিছু লোক নানা কথায় আটকে থাকে কিছুক্ষণ। এদের মধ্যে আনন্দ চ্যাটার্জি নেই। গত পাঁচ ছয়টা মিটিঙেই খুঁজেছে রতন। আনন্দ চ্যাটার্জিকে দেখা যায়নি। সেই ঘোমটা টানা বউটিকেও নয়।

অন্যমনস্ক রতন মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে ধীরগতিতে একটা খন্দ পার হয়ে কাঁচা রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়েই চমকে উঠল। বাঁ ধারে একটা জামগাছের তলায় সেই প্রস্তরমূর্তি। আজ সঙ্গে মেয়েটা নেই, স্বামীও নয়। একা একটা বউমানুষ তেমনি মুখটা সাবধানে ঘোমটায় ঢেকে দাঁড়িয়ে, নড়ছে না, একদৃষ্টে তাকেই দেখছে যেন। ভুলও হতে পারে। এ হয়তো আনন্দ চ্যাটার্জির বউ নয়। অন্য কেউ। কিন্তু ভঙ্গিটা হুবহু একই রকম।

কেন যে বুকটা ধকধক করছে এক অজানা ভয়ে কে জানে। তবু বাইকটা থামিয়ে একটু চেয়ে রইল রতন। তারপর বাইক ছেড়ে দিল। ভিতরে একটা ভয় আর আশঙ্কা ঘুলিয়ে উঠছে তার। মুখটা দেখতে দিচ্ছে না। চৌদ্দ বছরের পুরনো কোনও অতীত হানা দিচ্ছে কি মাঝে মাঝে? ভয় সেইটাই। এখনও কি অনিকেত একটা মায়া হাহাকার করে খুঁজে বেড়াচ্ছে হারানো ধন।

না ভাববে না রতন। তার এখন অনেক কাজ। অনেক অনেক কাজ।

জয়দেবের মেলা থেকে সিউড়ি হয়ে, শান্তিনিকেতন ঘুরে ফের গাঁয়ে ফিরল পরাণ। সঙ্গে মারিয়া। সন্ধেবেলায়। আজ আর হুলুস্থুল পড়ল না। তবু কৌতূহলী লোকজন উঁকি ঝুঁকি দিল কম নয়। জ্যাঠাইমার মুখ গোঁজ। সারা বাড়িতে ফিসফাস।

দোকান হয়ে রতন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত হয়ে গেছে।

পরাণ বেরিয়ে এসে বলল, রতন নাকি রে?

আরে বড়দা! কখন এলে?

এসে অবধি মারিয়া তোর জন্য হ্যাদাচ্ছে। কোথায় গিয়েছিলি?

বুকটা দুলে উঠল রতনের, মারিয়ার মনে আছে তাকে? সে বলল,

মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। আজকাল দোকানেও বসতে হচ্ছে।

খোঁটায় বেঁধে ফেললি নিজেকে? বেশ করেছিস। মোটরবাইক কিনলি বুঝি!

হ্যাঁ।

ভালই হয়েছে। কাল মারিয়াকে নিয়ে ঘুরে আসিস। এই তো শেষ বার। আর আসবে না।

অবাক হয়ে রতন বলে, কেন বড়দা?

পরাণ হাঃ হাঃ করে হেসে বলে, বাঁধা মেয়েমানুষ তো নয়। আমাদের তো ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলে যাওয়া রে। মারিয়া চলল রাজস্থান, দক্ষিণ ভারত, তারপর উড়ে যাবে ভিয়েতনাম। ছাড়াছাড়ির সময় হল যে।

কোথায় মারিয়া বউদি?

তোর জন্য বসে ছিল এতক্ষণ। খুব টায়ার্ড ছিল তো, ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা মৃদু বিষাদ ঢেকে দিল তার আনন্দকে। এই যাযাবর স্বভাবের মেয়েটি যে একদিন দূরে যাবে এ তো জানাই ছিল তার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি!

ঘরে ফিরে সে দেখল তার বাবা নিজের ঘরে বসে কিছু কাগজপত্র বের করে দেখছে মন দিয়ে। মনে হল, পুরোনো চিঠিপত্র।

সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সে আজ দরজার পর্দাটা সরিয়ে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় ডাকল, বাবা।

অভিরাম মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল শুধু। চোখে ঘোর অন্যমনস্কতা।

তোমার শরীর কেমন?

খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব দিল অভিরাম, ভাল।

আমাদের বাড়ি সম্পত্তি সব ভাগ হওয়ার কথা শুনছি। ব্যবসাতেও লস হচ্ছে বলে বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে আলোচনা হচ্ছে। আমাদের তো কিছু একটা করা উচিত।

অভিরাম একটু চুপ করে থেকে তেমনি নির্বিকার গলায় বলল, ওসব আমার আর ভাল লাগে না।

সবাই বলছে তুমি যখন দেখতে তখন সব ঠিকঠাক চলত।

অভিরাম একটু বিরক্ত গলায় বলল, ওসব তোরা দ্যাখ।

আমি তো অত ভাল বুঝি না। অভিজ্ঞতা নেই। কাকারা পেরে উঠছে না।

অভিরাম এবার আর একটু বেশিক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বলল, খাটতে হয়। খুব খাটতে হয়।

কথা শেষ হয়ে গেল। তবু এও অনেক। বাবাকে হয়তো আর

কাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যাবে না। ওই সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা বাবার জীবনে লবণটা হরণ করে নিয়ে চলে গেছে। বাবা আর জীবনে আস্বাদ পাচ্ছে না। আর ওই ভদ্রমহিলা এক বুক তেষ্টা নিয়ে মাঠ ভর্তি লোকের রাজনৈতিক মিটিংয়ে গিয়ে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে একা, ভিখিরির মতো। আর কী লাভ তাতে? আর কী লাভ?

রাতে ফের রবিনসন ক্রুশো পড়ছিল রতন। পাশের ঘরে বাবার এপাশ ওপাশ। নেশা করছে না বলে ঘুম আসে না বাবার। সময় কাটতে চায় না তার। বারবার উঠে জল খায়। এই প্রচণ্ড পৌষের শীতে উঠে পেচ্ছাপ করতে যায় বাইরে। ঢেঁকুর তোলে অনেক।

রতন বই রাখে। ছেলেকে অনেক মূল্য দিয়েছে বাবা। অনেক কথা শুনেছে। কিন্তু রতন ভুল করেনি তো! মদ খেয়ে তবু তো ভুলে থাকত লোকটা। এখন হয়তো মনে পড়ছে আরও। তীব্রতর হচ্ছে দহন। ও কার চিঠি পড়ছিল বাবা?

ভোরের প্রথম আলোটি যখন মুখে এসে পড়ল তখন বড় অপরূপ দেখাল মারিয়াকে। একটু কৃশ হয়েছে, রং মরে গেছে এদেশের জলবায়ুতে। মুখে একটু লাজুক হাসি। মাথা মুখ ঘিরে একখানা সিল্কের সবুজ স্কার্ফ, সবুজের ওপর জংলা ছাপের একটা গাউন, তার ওপর গরম কাপড়ের সবুজ জ্যাকেট।

হাই রতন।

অনেক বাংলা শিখেছে মারিয়া। 'রটন' নয়, পরিষ্কার 'রতন' ডাকল।

হাই মারিয়া।

মোটরবাইকটা দেখে বলল, এটা কেন? বাইসাইকেলটা কী হল?

এটা ভাল নয়?

হ্যাঁ, এটাও ভাল। ওটা আরও ভাল। থ্রিলিং।

তার কাঁধে মারিয়ার হাত। সকালের কুয়াশা মাখা আলোয় মোটরবাইকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছেড়ে দিল রতন।

ফের চাষবাড়ি। মারিয়া চাষবাড়িতেই আবার যেতে চায়। কেন, কে জানে! সেই চুম্বন আজও ভোলেনি তো রতন। তাই একটু লজ্জা করছিল মারিয়ার চোখে চোখে চাইতে। কিন্তু এসব ছোটোখাটো জিনিস ওরা তো গায়েও মাখে না। মারিয়ার ঠোঁটে কত পুরুষের ঠোঁটের স্পর্শ আছে কে জানে।

আজ চাষবাড়ি ফাঁকা। মাত্র একটা ছেলে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। আর সবাই মাঠে গেছে। ফসল তোলার সময়। এই দানাশস্য সংগ্রহ করার সময় তার বাবা এসে চাষবাড়িতে থানা গেড়ে বসে থাকত। ফসলের হিসেব ঠিক থাকত তখন। এখন কেউ আসে না। কর্মচারীদের ওপর নির্ভর। ওরা যা খুশি হিসেব দেয়, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কালী নামে ছেলেটা তাড়াতাড়ি উঠে এসে ঘর খুলে দিয়ে বলল, রস খাবেন? সকালেই পাড়া হয়েছে।

না, রস খাবে না মারিয়া। রতনের হাত ধরে বলল, চলো, হাঁটি।

ফের সেইদিনের মতোই সবুজ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আলপথে আগুপিছু হাঁটল তারা। রতনের বুকে একটু কম্পন। আবারও কি...? না, ওই পাপচিন্তা সে আর করবে না। শত হলেও পরাণদার বউ, বা বউয়ের মতোই।

খুব আনমনে হাঁটছিল মারিয়া, ওর চলার যেন শেষ নেই। এত হাঁটে কেন মেয়েটা? এত কেন ঘুরে বেড়ায়? রাজস্থান যাবে। তারপর দক্ষিণ ভারত। তারপর ভিয়েতনাম। তারপরেও নিশ্চয়ই আছে। কোথায়? কত দূর?

সবুজে সবুজ মারিয়া চারদিকের সবুজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যেন। বনদেবীর মতো।

মারিয়া।

হুঁ।

আর কতদুর যাবে?

তোমার ভাল লাগছে না?

হ্যাঁ। কিন্তু আমরা অনেক দূর চলে এসেছি।

পাশের ছোলা খেতে নেমে শুঁটি তুলল মারিয়া, কেউ বকবে না তো রতন?

না না, এসব তো আমাদেরই খেত।

সবুজ ছোলা বের করে কয়েকটা রতনের হাতে দিয়ে বলল, খাও।

রতন হাসল, বলল, ইউ লাইক ইট?

মুখ ভরে ছোলা চিবোতে চিবোতে মারিয়া শুধু হাসল। তারপর হঠাৎ তার দিকে ফিরে বলল, ইউ হেট আস, ডোন্ট ইউ?

আমি! না তো!

আই নো ইউ হেট হোয়াইট পিপল।

উই ডোন্ট মারিয়া। বিশ্বাস করো।

মারিয়া কী বুঝল কে জানে। মুখ ফিরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ বাদে ফের বলল, এভরি বডি হিয়ার হেটস হোয়াইট পিপল।

আলপথে হাঁটলে দ্বিগুণ পরিশ্রম হয়। এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু পথে সাবধান না হলে হোঁচট খাওয়া অবধারিত। কিন্তু মারিয়া হাঁটছে যেন কতকালের চেনা পথ। ক্লান্তিও নেই। এ দেশের পথ ও চিনে গেছে।

আজও একটা মাঠের ধারে বসল তারা। তেমনি গাছের ছায়ায়। পাশাপাশি এবং কাছাকাছি। মারিয়ার হাতে রতনের একটা হাত ধরা, বুক দুরুদুরু করছে কখন থেকে। মনে পাপ। মনে প্রত্যাশা। আবার

লজ্জা হচ্ছে, ঘেন্নাও হচ্ছে নিজেকে। এ এক অদ্ভুত বিপরীত কাজ করছে তার ভিতরে। একেই কি সুমতি আর কুমতির লড়াই বলে?

ঠিক সেদিনকার মতোই কেমন স্বপ্নাতুর ধ্যানস্থ হয়ে গেল মারিয়া। নিথর, নিস্তব্ধ, চেয়ে আছে সামনের আদিগন্তের দিকে, কিন্তু সেই চোখে যেন কোনও অবলোকন নেই। রতন এই অন্যমনস্কতার অর্থ জানে না। হয়তো বাউলদের ওরকম কিছু হয়। সমাধির মতো। সেদিনও যখন তাকে চুমু খেয়েছিল মারিয়া, তাতে যেন আশ্লেষ ছিল না। ছিল এক জরুরি প্রয়োজন।

ওর ধ্যান ভাঙাতে সাহস হল না রতনের। সেও চুপ করে বসে রইল। বুকের মধ্যে সেই বাঁদর নাচের ডুগডুগি বেজে যাচ্ছে অবিরল।

হঠাৎ, একেবারে আচমকাই তার হাতটা খিমচে ধরল মারিয়া। এত জোরে যে, রতনের মজবুত হাতও যেন মটমট করে উঠল। থরথর করে কাঁপছিল হাতটা। তারপর আচমকাই ফের শিথিল হয়ে গেল। স্বপ্নাতুর দু'খানা চোখ তার দিকে ফেরাল মারিয়া। ফিসফিস করে বলল, দ্যাট ওয়াজ ইজাকুলেশন।

ইজাকুলেশন মানে রতন জানে। কী করে জানে তা বলতে পারবে না। ওটা যৌন মিলনের চরম আনন্দের অনুভূতি। সেটা কি ধ্যানেও হয়! কে জানে বাবা, রতন তো সাধন রহস্য জানে না। শুধু বোকার মতো হাসল।

এখন ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন আর তৃপ্ত দেখাচ্ছিল মারিয়াকে। মুখে সামান্য হাসি। এ কি একজন সাধিকা, না সাধারণ মেয়ে? বায়ুগ্রস্ততা, মৃগী, পাগলামি সবই তো ধর্মের নামে চলে যায়। সেসব কিছু?

হঠাৎ মারিয়া উঠে হাত ধরে টেনে তুলল তাকে, চলো রতন।

সামান্য হতাশ হল কি রতন? মনে পাপ। মনে সাপ। মনের গহন রাজ্যে কত পাপ যে বাসা বেঁধে আছে। আজ আরও একটি চুম্বনের বিপ্রতীপ ইচ্ছে কি ছিল না তার মনের মধ্যে?

চাষবাড়ি এখনও ফাঁকা। শুধু কালী বসে ডাবের মুখ কাটছিল মন দিয়ে।

তারা ঘরে এসে বসল একটু। কালী দুটো বড় স্টিলের গ্লাসে ডাবের জল দিয়ে গেল।

ডাবের জলে চুমুক দিয়ে গেলাসের কানার ওপর দিয়ে রতনের দিকে চেয়ে আছে মারিয়া একদৃষ্টে। চোখে কি একটু কৌতুক! কী দেখছে মারিয়া?

ছ'ফুটের ওপর লম্বা, মজবুত গড়নের সুদর্শন এক পুরুষকে? চোখ নামিয়ে নিল রতন।

মুখ থেকে গ্লাসটা নামিয়ে মারিয়া তার দিকে অকপট চোখে চেয়ে সস্নেহে, একটু করুণাভরে মারিয়া বাংলায় বলল, রতন, তুমি কি আমার

সঙ্গে একটু সেক্স চাও?

রতন আপাদমস্তক শিউরে উঠল। কী বলে মেয়েটা? কী বলছে এ সব? সে লাল হয়ে গেল লজ্জায়, কান গরম।

নো মারিয়া নো।

মারিয়া খুব করুণাভরে একটু হাসল, তোমার চোখ দেখে মনে হয় চাও। কোনও বাধা নেই, ইউ মে মেক লাভ টু মি। নাউ। এটা তো খুব সুন্দর জায়গা।

মনের গহীন রাজ্যে জেগে উঠল একশো সাপ। ছোবলে ছোবলে পাগল করে তুলছে তাকে। বিকারগ্রস্তের মতো সে বলে উঠল, না মারিয়া...

মারিয়ার চোখে কোনও কাম নেই। আশ্লেষ নেই। শ্লথ শরীর, শ্রান্ত চোখ। শুধু একটু কৌতুকের হাসি তার মুখে, যেন ভিখিরিকে দয়া করতে চায় এমন একটা ভাব।

অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করছিল রতনের মাথা।

অনেকটা মায়ের মতো স্নেহের সুরে তাকে অভয় দিয়ে মারিয়া বলল, ইউ আর স্কেয়ার্ড। ডোন্ট বি।

ডাবের জলটা নিঃশেষে খেয়ে একটা শ্বাস ফেলে মারিয়া বাংলায় বলল, চলো রতন, ফিরে যাই।

অধোমুখে রতন উঠে দাঁড়াল।

ফেরার সময়েও মোটরবাইকের পিছনে বসে তার কাঁধে হাত রেখেছে মারিয়া। নরম, এলানো হাত। কিন্তু রতনের কেবলই মনে হচ্ছে একটা গোখরো সাপ লতিয়ে আছে কাঁধে। গা শিরশির করছে তার।

মারিয়াকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সারাদিন পার্টি অফিসে কাটিয়ে দিল রতন। সারাক্ষণ নিজের কাছে লজ্জায় নিজেই মরে যাচ্ছে সে। কান গরম, মাথা গরম, শরীরে অস্থিরতা। কামস্পৃহা চোখে ফুটে উঠেছিল তার! মারিয়ার চোখে ধরা পড়ে গেছে সে। মহানুভব ওই মহিলা করুণাপরবশ তাকে নিজের দেহখানি ভোগ করতে দিতে চেয়েছিল। এই লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

অনেক রাতে বাড়ি ফিরল সে। চুপিচুপি ঘরে ঢুকল। অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল বিছানায়। সারা বাড়ি নিঃঝুম। শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না তার। নিজের প্রতিমা তুমি কেন নিজেই বিসর্জন দিয়ে গেলে মেমসাহেব? কেন ওরকম নির্লজ্জের মতো চোখে চোখ রেখে বললে ও কথা? ওরকম বলতে আছে? রচনা করতে শেখোনি তুমি? তোমার কি শিল্প নেই? ভূমিকা নেই? আলাপের আগেই এসে গেল ঝালা? দেখ, তোমার কথা ভাবলেই আগে আমার বুক দুরুদুরু করত। আজ আর দুরুদুরু নেই।

খুব কান্না পাচ্ছিল রতনের। খুব। হ্যাঁ মেমসাহেব। তুমি দূরে চলে

যাও। খুব, খুব দূরে চলে যাও।

ভোর রাতে পরাণ আর মারিয়া চলে গেল। আর আসবে না মারিয়া। আর কখনও আসবে না।

সকালে ননীদাদু গামছা পরে গাড়ু হাতে মাঠপানে যাচ্ছিল। রতনকে দেখে কাছে এসে বলল, দেখলি তো চিড়িয়া উড়ে গেল! বলেছিলুম না এ টেকবে না! সাদায় কালোয় কি মিশ খায় রে বাপ! সাতপাক হল না, যজ্ঞ হল না, ও বিয়ে কি টেকে?

গোপালগঞ্জে ধুন্ধুমার মিটিং ছিল আজ। লোকে লোকারণ্য। চুটিয়ে বক্তৃতা দিল রতন। হাততালি পেল প্রচুর। গত অগ্রহায়ণে চব্বিশ বছর পূর্ণ হল তার। আনন্দ চ্যাটার্জি খুব ভুল বলেনি। হয়তো তার মধ্যে নেতা হওয়ার সহজাত গুণ আছে। সেটা সে এর মধ্যেই টের পেতে শুরু করেছে। মিটিংয়ের পর যখন বহু লোক ছেঁকে ধরল তাকে তখনই টের পেল, নতুন জগতে পা রাখছে সে।

কিন্তু পিছুটানও বড় কম নেই তার। বাবা, ব্যবসা, পারিবারিক বন্ধন। এগুলো থেকে মুক্ত হলে আরও একটু এগোতে পারত সে। অন্তত বাবা যদি ফের গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারত তাহলেই অনেকটা হত। কিন্তু মদ ছাড়লেও বাবা নিঝুম, চুপচাপ, নিষ্ক্রিয়। কথা উঠলে বলে, ওসব আমার আর ভাল লাগে না।

মুশকিল হল, রতন আজকাল ব্যবসাও ভাল বোঝে। তিনটে দোকানে ঘুরে ফিরে সে সব সামলাতে শিখছে আজকাল। চাষবাড়িতে যাচ্ছে নিয়মিত। সুফল ফলতে শুরু করেনি এখনও। সে এখনও শিক্ষার্থী মাত্র। কিন্তু পরিশ্রমের কিছু ফল তো পাওয়া যাচ্ছে। তার বিমুখতা কেটেছে, জড়তা নেই। আর আগ্রহ বাড়ছে ব্যবসায়, চাষবাসে। কাকা, জ্যাঠারা প্রকাশ্যেই বলছে, বাপকা ব্যাটা। কথাটা বড় কম কথা নয়।

মিটিংয়ের ভিড় ভাট্টা শেষ হলে মিটিংয়ের মাঠের কাছেই কর্মীরা নিয়ে গিয়ে একটা ভারী পরিচ্ছন্ন গেরস্ত বাড়িতে তাদের বসাল। সামনে বেড়ে দেওয়া হল গরম লুচি, আলুর দম, মিষ্টি। গৃহকর্তা মহেন্দ্র বিশ্বাস সামনে দাঁড়িয়ে খুব হিঃ হিঃ করে আপ্যায়ন করতে লাগলেন।

রওনা হবে বলে যখন উঠতে যাচ্ছিল তখন মহেন্দ্র বিশ্বাস ভারী কাচুমাচু হয়ে সামনে এসে বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল বাবা।

অবাক হয়ে রতন বলল, আমার সঙ্গে?

আজ্ঞে আপনি পার্টির লোক, নেতা মানুষ। বিচক্ষণ। কথাটা না বললেই নয়।

বলুন।

মহেন্দ্র হাত কচলে বলল, সকলের সামনে বলার মতো নয়। একটু প্রাইভেট আছে বাবা।

দলের ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল তার জন্য। একথা শুনে বলল, আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

রতন বলল, না, তোমরা চলে যাও। আমার তো মোটরবাইক আছে। আমি ঠিক চলে যাব।

ছেলেরা চলে যাওয়ায় মহেন্দ্র বিশ্বাস বলল, বড় বিপদে পড়ে আপনাকে আটকাচ্ছি বাবা, কিছু মনে করবেন না। গাঁয়ের মানুষের কাছে ভেঙে বলতে সাহস হয় না, তারা পাঁচ কান করে বেড়াবে। আপনি নেতা মানুষ, একটা দায়িত্ব আছে, ভরসা করে আপনাকে বলা যায়।

অত সঙ্কোচ করছেন কেন? বলুন না।

তাহলে একটু বসুন, আমি কাগজখানা নিয়ে আসছি।

মহেন্দ্র ভিতরে গিয়ে হাতে একটা কাগজ নিয়ে ফিরে এল। তার পিছু পিছু ভারী লক্ষ্মী চেহারার তার বউ।

মহেন্দ্র কাগজখানা তার হাতে দিয়ে বলল, এ কাগজে কী লেখা আছে তা পড়ে আমাদের একটু বুঝিয়ে দিতে হবে বাবা। আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

রতন কাগজটা নিয়ে দেখল, কলকাতার একজন খুব বড় ডাক্তারের লেখা একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট। তাতে টাইপ করে লেখা ডাক্তার জনৈক বিমান রায়কে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বিমান রায় একজন সুস্থ, সবল এবং যৌনক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সক্ষম যুবক। ক্লিনিকাল টেস্টে তার কোনও যৌন দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি বিয়ে করে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপন করতে পারেন।

মুখ তুলে রতন বলল, এটা একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট। কলকাতার খুব বড় একজন ডাক্তারের লেখা। এতে বলা হয়েছে যে বিমান রায়ের কোনও সেকসুয়াল ডেফিসিয়েনসি নেই। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো!

মহেন্দ্র জুলজুল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখটায় দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। বলল, কাগজটা জালি নয় তো বাবা! আমার বউ ঠিক বিশ্বাস করতে চাইছে না।

রতন হেসে বলল, এই সার্টিফিকেটের দরকার হচ্ছে কেন আপনাদের? ব্যাপারটা কী?

বউটি এগিয়ে এসে বলল, ওই ছেলেটির সঙ্গে আমার বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে বাবা। কিন্তু নানা জন নানা কথা বলছে বলে আমরা একটু ভয় পাচ্ছি। ছেলের নাকি পুরুষত্ব নেই। যিনি সম্বন্ধ এনেছেন সেই সতীশকাকাকে ব্যাপারটা বলায় উনি ছেলেকে গিয়ে বলেন। পরশু সতীশকাকা ওই কাগজখানা এনে দিয়ে বললেন পাঁচজনকে দেখাও। কত বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট জানো! তোমরা উড়ো খবর শুনে পিছিয়ে যাচ্ছ। আপনি কি বলছেন বাবা যে, ওই সার্টিফিকেট ঠিক

আছে?

রতন ভ্রু কুঁচকে কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল। তারপর বলল, এটা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। যে কেউ এ জিনিস কম্পিউটারে তৈরি করে নিতে পারে। লেটারহেড থেকে বয়ান অবধি। কাজেই এটা যে আসল সার্টিফিকেট তা বলা যাবে না। সিওর হতে গেলে আপনাদের উচিত ডাক্তারবাবুটিকে ফোন করা।

মহেন্দ্র সভয়ে বলল, ও বাবা! অত বড় ডাক্তার আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কেন?

আপনাদের কি লোকটাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?

মহেন্দ্র আমতা আমতা করে বলল, তা ঠিক নয়। তবে ছেলের আগের বউ ফাঁসি দিয়ে মরেছিল বলেই কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেকছে আমার বউয়ের।

রতন একটু হেসে বলল, বিমান রায়কে আমি চিনি। সদরে আমার দিদির বাড়ির পাশেই বাড়ি। কিন্তু এসব গোপন ব্যাপার তো বাইরের লোকের জানার উপায় নেই। তবে আমার একটা জিনিস অদ্ভুত ঠেকছে।

কী বলুন তো বাবা?

আপনারা মেয়ের পক্ষ। আপনারা ছেলেকে ইম্পোটেন্ট বলে সন্দেহ প্রকাশ করলে পাত্রপক্ষের তো প্রেস্টিজে লাগার কথা। এদেশে তো বিবাহযোগ্যা মেয়ের অভাব নেই। অন্য পাত্রপক্ষ হলে বিয়ে ভেঙে দিত। কিন্তু উনি তো দেখছি নিজের সপক্ষে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট অবধি পেশ করেছেন। আপনারা কি অনেক পণটন দিচ্ছেন নাকি?

চোখ বড় বড় করে মহেন্দ্র বলল, পণ! বলেন কি বাবা! আমি সামান্য মানুষ। পণ দূরস্থান, তারা বরং উল্টে আমাদের বিয়ের খরচ দিতে চাইছে।

সে কী? দেশে কি সত্যযুগ এসে গেল নাকি?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, না বাবা, সত্যযুগ আর আসবে না। কিন্তু এই মেয়ের জন্য পাত্রপক্ষের রোখ চেপে গেছে। তাদের এ মেয়েই চাই।

কেন, বিমানের সঙ্গে আপনার মেয়ের কি প্রেমট্রেম হয়েছে?

ঠিক উল্টো। মেয়ে প্রথম থেকেই এই বিয়েতে রাজি নয়। দিন রাত কাঁদে মেয়েটা।

রতন ভ্রু কুঁচকে বলল, তাহলে বিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন না কেন?

বউমানুষটি হঠাৎ আঁচলে চোখ মুছে বলল, আমাদের বড় বিপদ যাচ্ছে বাবা। আজ মিটিংয়ে আপনাকে দেখে আমার বড় ভরসা হল। কত লম্বা বাবা আপনি, চেহারাও দেবদূতের মতো। তাই ওঁকে বললাম, ওই তেজি মানুষটার কাছে সব ভেঙে বলো, উনি ঠিক ব্যবস্থা করতে পারবেন।

রতন হেসে ফেলল, বলল, চেহারা দেখে কি কিছু বোঝা যায়?

মহেন্দ্র বলল, চেহারাও তো কিছু কম কথা কয় না বাবা। কিন্তু আসল কথা হল বিয়ে ভাঙারও বিপত্তি আছে। সতীশকাকা বলে গেছে বিয়ে যদি ভেঙে দিই তাহলে পাত্রপক্ষ মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। বিয়ের প্রস্তুতি বাবদ তারা নাকি অনেক টাকা খরচ করে বসে আছে। বাড়িঘর মেরামত করেছে, রং করেছে, মেঝেতে মার্বেল বসিয়েছে। আর আপনার কাছে স্বীকার করি বাবা, আমাকে থোক কিছু টাকাও দিয়েছে গোপনে। লোভে পড়ে নিয়েছি বাবা, পরিবারকেও জানাইনি। এখন আমার ছুঁচো গেলার অবস্থা।

বউটি বলল, শুধু তাই নয় বাবা, সতীশকাকা ঠারেঠোরে বলে গেছে বেশি গাঁইগুঁই করলে তারা মেয়ে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে। তাদের লোকবল আছে, টাকার জোর আছে।

মহেন্দ্র বলল, আপনি পার্টির লোক বাবা, এর একটা বিহিত আপনিই করতে পারেন। ক্যাডার ট্যাডার লাগিয়ে পারেন না বাবা?

রতন ম্লান একটু হেসে বলল, সেটা পার্টির কাজ নয়। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে বিমান রায় নিজেই পার্টির একজন মস্ত প্যাট্রন। মোটা টাকা চাঁদা দেয়। সদরে তার ওপর কথা কওয়ার লোক নেই। জেলা কমিটির মেম্বার এবং আরও সবাই তাকে খাতির করে।

হঠাৎ মহেন্দ্র যেন দপ করে নিবে গেল। চোখে ফুটে উঠল ভয়। স্খলিত মিনমিনে গলায় বলল, তাহলে তো বড্ড ভুল করে ফেললাম বাবা। বিমান রায় যে পার্টির লোক তা যে জানা ছিল না আমার।

বড়লোকরা পার্টিকে হাতে রাখতে ওসব করে। টাকার জোরে নেতাও হয়। তবে ভয় পাবেন না। আমি পার্টিতে আছি বটে, কিন্তু না থাকার মতোই। আমার অনেক দায়দায়িত্ব আছে। পার্টি করি খানিকটা ঝোঁকে। বিমান রায় আমাকে চেনেই না।

বউটি এগিয়ে এসে বলল, ওঁর কথা ধরবেন না। আমি আপনাকে প্রথম দেখেই যা বুঝেছি তা বদলাবে না। আমাদের জন নেই, সহায়ও কেউ নেই। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি বললেন, বিমান রায়ের বাড়ির পাশেই আপনার দিদির বাড়ি। সেই দিদি কি রত্না?

রতন অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলেন?

রত্না সব জানে। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। রত্নাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি সব জানতে পারবেন। বিমানের আগের বউ কেন মরেছে তা একমাত্র রত্নাই জানে।

আপনি আমার দিদিকে চেনেন?

হ্যাঁ বাবা, চিনি। উনি ওদের সঙ্গে মেয়ে দেখতে এসেছিলেন।

রতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গাড্ডাটা কিছু গভীর।

কিছু উপায় হবে না বাবা? আপনার মুখটা যেন কেমনধারা হয়ে

গেল!

রতন ম্লান হেসে বলল, একে বোধহয় ইনফ্যাচুয়েশন বলে।

তার মানে কী বাবা?

বিমান রায় বোধহয় একতরফা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার অহংকারও প্রবল।

সে তো বুঝতেই পারছি। এখন কী করব?

রাতারাতি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন?

না বাবা, সে কি সম্ভব? গাঁ দেশে পাত্র পাওয়া তো সোজা নয়। অগা বগা জুটলে তো মেয়ের কপাল পুড়বে। বড় আদরের মেয়ে।

আমি অনেক দূরে যাব। আজ আমাকে উঠতে হবে।

আমাদের কথাটা কি ভাববেন বাবা?

ভাবব।

কিছু করবেন তো?

করার চেষ্টা করব। বিয়ের তারিখ কি ঠিক হয়েছে?

হতে বিশেষ বাকিও নেই। তারা মাঘ মাসে তারিখ ফেলেছিল। মেয়ের জন্মমাস বলে আমরা ঠেকিয়েছি। কিন্তু ফাল্গুন পেরোতে দেবে না, বলেই রেখেছে।

হাতে একটু সময় তো আছে দেখছি।

হ্যাঁ বাবা। তবে দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বড্ড ভয়।

রতন বেরিয়ে এল। এত লোক থাকতে তাকেই যে কেন মুরুব্বি ঠাওরাল এরা তা কে জানে! বাইরে তার মোটরবাইকটা দাঁড় করানো। দলের ছেলেগুলো অপেক্ষা করে করে চলে গেছে।

স্ট্যান্ড থেকে মোটরবাইকটা নামিয়ে সে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

ফটকের কাছেই স্বামী-স্ত্রী দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

একটু দেখবেন বাবা।

দেখব।

হেডলাইট জ্বেলে একটু স্পিডেই বাইকটা ছেড়ে দিল রতন। গেরো আর কাকে বলে। বাড়ি ফেরার আগে একবার সদরে দিদির বাড়ি হয়েই যেতে হবে। একটু রাত হয়ে যাবে ফিরতে।

মস্ত ঝুপসি জামগাছটার তলায় হেডলাইটের আলো পড়তেই চমকে ব্রেক কষল সে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মুখ আতঙ্কিত।

মেয়েটাই এগিয়ে এল, আমি হৈমন্তী।

রতন অবাক হয়ে বলল, কে তুমি?

মহেন্দ্র বিশ্বাসের বড় মেয়ে।

রতন বড় বড় চোখ করে মেয়েটাকে দেখছিল। না, বিমান রায়কে দোষ দেওয়া যায় না। কেউ কেউ এর জন্য পাগল হলেও হতে পারে।

আমি আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

কিছু বলবে?

বলব। কিন্তু কী বলব তা জানি না। আমার দোষ ধরবেন না তো?

আট

তুই নাকি বাবাকে মদ ছাড়িয়েছিস?

তোকে কে বলল?

কেন, খবর দেওয়ার লোকের অভাব? কাকারা আসে, জ্যাঠামশাই আসে। তারাই বলল, আজকাল রতন বাবার দিকে নজর দিয়েছে। চৌদ্দ বছরের নেশা ছাড়িয়েছে। কী করে ছাড়ালি রে?

রতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সেটা আমিই কি ভাল করে জানি?

তার মানে?

জাস্ট একদিন খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম, মদটা না খেলেই তো হয়। কিংবা ঠিক তাও বলিনি। বলেছিলাম বাইরে মদ খেয়ে সিন ক্রিয়েট করার চেয়ে ঘরে বসে খাওয়া ভাল। জাস্ট একদিনই বলেছিলাম।

তাতেই ছেড়ে দিল?

তাই তো দেখছি। সেদিন থেকে আর খাচ্ছে না। এক মাসের ওপর হয়ে গেল।

এখন কী করে বাবা?

খুব চুপচাপ। কথা বেশি বলে না।

কারও সঙ্গেই নয়?

না। গত চৌদ্দ বছরেই তো বাবার কথা কমে গিয়েছিল। শুধু মদ খেলে গালাগাল করত। এখন আরও চুপচাপ। রাত দশটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসে। ভাত-টাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারি, ঘুম হয় না। খুব এপাশ ওপাশ করে। অনেক ঢেঁকুর তোলে। মদ খায় না বলেই হয়তো পেটে বায়ু জমে যায়।

আহা রে! চেহারাটা কি খারাপ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। খুব। আজকাল দেখছি মাঝে মাঝে রাতে বসে মায়ের পুরনো চিঠি পড়ে।

সত্যি! কী করে বুঝলি মায়ের চিঠি?

দেখেছি। চিঠিগুলো একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাবার বালিশের তলাতেই থাকে। বের করে দেখেছি।

পড়েছিস?

না। স্বামী-স্ত্রীর চিঠি পড়ব কেন? মোট একুশখানা চিঠি আছে। মা যখন বাপের বাড়ি যেত তখন লিখত।

আরও থাকার কথা।

হয়তো আছে কোথাও। নয়তো হারিয়ে গেছে। আমার মনে হয় বাবা এখনও মনে মনে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাইরে খুঁজে তো আর লাভ নেই। এখন চলছে মনের খোঁজ।

এখন বাবার জন্য আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে।

পরে কাঁদিস দিদি।

ছলছলে চোখে একটু হাসল রত্না। তারপর বলল, মোটরবাইক কিনেছিস আমাকে একটুও জানাসনি। দেখালিও না। তুই এমন কেন রে?

আরে যেদিন কিনলাম সেদিনই একটা মিটিঙে যেতে হল। কিনেই সোজা সেখানে চলে গেছি। রাত হয়ে গেল, আর আসা হয়নি।

এখনও পার্টি করছিস?

করছি একটু আধটু। মাখামাখি কমেছে। সময়ও পাই না। ব্যবসা দেখতে হচ্ছে তো!

শুনেছি তুই ব্যবসাতে মন দিয়েছিস। ওটাই কর না কেন! খুনোখুনির রাজনীতিতে তোর যাওয়ার দরকার কী? আমার একটুও ভাল লাগে না। সবসময়ে তোর জন্য চিন্তা করি।

মানুষকে তো কিছু করতে হবে।

মাঝখানে নাকি ঠিক করেছিলি পার্টি অফিসে গিয়ে থাকবি। সত্যি নাকি?

বাড়িতে ভাল লাগত না। বাবা ওরকম, কাকা জ্যাঠাদের মধ্যেও ঠিক সমঝোতা হচ্ছে না। কারও কোনও ব্যবসাবুদ্ধি তো নেই। বাবাই সব সামলাত। বাবা আলগা হওয়ার পর ব্যবসাও ডুবতে বসেছিল। চাষের আয়ও কমে গেছে।

তুই পারবি?

বাবার মতো পারব না। কিন্তু আমার খারাপ লাগছে না।

তোর শরীরে তো বাবার রক্তটা আছেই। পারবি।

রক্ত থাকলেই তো হবে না। বুদ্ধি চাই। বুঝে নিতেই সময় চলে যাচ্ছে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করে নিস না কেন?

মাথা নেড়ে রতন বলল, বাবা কেবল বলে, ওসব আর আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছে, উৎসাহ, উদ্যোগ সব মরে গেছে।

তাহলে এবার একবার বাবাকে দেখতে যাব। কতকাল যাই না। পরাণদার মেম-বউকে নাকি তুই সাইকেলের রডে চাপিয়ে চাষবাড়ি নিয়ে গিয়েছিলি! এ মা! পারলি!

রতন মাথা নিচু করে লাজুক হেসে বলল, হ্যাঁ।

মেমগুলো যা ঢলানি হয়। কথা বললি কী করে?

ইংরিজি বাংলা মিশিয়ে। মারিয়া তো বাউল।

বাউল না হাতি। চরিত্র বলে ওদের আছে নাকি কিছু? আজ রাতে থেকে যা। কত্ত কথা জমে আছে।

না রে। বাবাকে ছেড়ে থাকতে সাহস হয় না।

ওমা। কেন?

মদ ছাড়ার পর একটা ভীষণ ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে তো। উইথড্রয়াল সিমটম দেখা দিয়েছে। পুরনো নেশা ছাড়লে এরকম হয়। এসময়ে একা থাকলে সুইসাইড করার ইচ্ছে জেগে উঠতে পারে। সেইজন্যই ভয় পাই।

ও বাবা! তাহলে থাকগে, ফিরেই যাস। ফিরেই যদি যাওয়ার মতলব ছিল তাহলে দেরি করে এলি কেন?

এসেছি একটা দরকারে। বেগার খাটা বলতে পারিস। তুই গোপালগঞ্জের মহেন্দ্র বিশ্বাসকে চিনিস?

অবাক হয়ে রত্না বলল, হ্যাঁ তো! তুই কী করে চিনলি?

গোপালগঞ্জে আজ মিটিং ছিল। মিটিঙের পর আমাদের নিয়ে গেল মহেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে জলখাবারের জন্য। সেখানেই একটা ফালতু ফ্যাকরায় জড়িয়ে পড়লাম।

ওদের মেয়েকে নিয়ে নাকি?

হ্যাঁ। বিমান রায়ের সঙ্গে নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রত্না বলল, বিমানের আগের বউ মধুরার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এ মেয়েটাকেও বোধহয় গলায় দড়ি দিতে হবে। কী যে সুন্দর মেয়েটা। দেখেছিস?

চোখ নামিয়ে নিয়ে রতন বলল, হ্যাঁ।

দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

শুনলাম বিমান রায় নাকি ওদের ওপর ফোর্স করছে বিয়ের জন্য।

আমিও তাই শুনছি। খেপে গেছে। ইমপোটেন্ট বলে জানাজানি হয়ে গেছে তো একটু।

ইমপোটেন্ট তো বিয়ে করতে চায় কেন? চিকিৎসা করাক।

ইমপোটেন্ট কিনা জানি না বাপু। তবে মধুরা তো বলত, তাকে উদোম করে নাচতে বলত। আরও অনেক কিছু। সে তোর শুনে কাজ নেই। দোষের মধ্যে মেয়েটার একটা প্রেমিক ছিল আগেকার।

ওরা একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখাল। একজন বড় ডাক্তারের। মনে হল কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। ব্যাপারটা জালি বলে তাদের সন্দেহ। ডাক্তারকে একবার ফোন করবি?

কিন্তু নম্বর?

ব্যবসাদার মানুষ তো, নম্বর একবার দেখলেই মনে থাকে। বলছি, টুকে নে।

রত্না দুটো ফোন নম্বর টুকে নিয়ে সবিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, একবার দেখেই মনে রেখেছিস?

হ্যাঁ।

ভাইয়ের চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে রত্না আদর করে বলল, তাহলে বোধহয় তুই বাবাকে ছাড়িয়ে যাবি। বাবার অঙ্কে খুব পরিষ্কার মাথা ছিল। দাঁড়া, এক্ষুনি এস টি ডি করে আসছি পাশের ঘর থেকে। নাকি তুই কথা বলবি?

পুরুষের গলা শুনলে পাত্তা দেবে না। তুই কর না।

রত্না পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করল। প্রায় মিনিট পাঁচেক।

ফিরে এসে মাথা নেড়ে বলল, ওরকম কারও চিকিৎসা ডাক্তার করেনি। রেকর্ড দেখেই বলল। এও বলল, উনি নাকি এই ডিজিজের ডাক্তারই নন।

তাহলে ফ্লস্?

তাছাড়া কি?

এ তো বেশ গাড্ডায় পড়ে গেছে মহেন্দ্র বিশ্বাস!

তোকে ধরল কেন?

সে একটা মজার কথা। ভদ্রমহিলার নাকি আমাকে দেবদূত মনে হয়েছে।

রত্না মুখ টিপে একটু হাসল। বলল, বুঝেছি।

কী বুঝলি?

সেটা কি মুখ ফুটে বলতে হবে? বোকা কোথাকার! মেয়েটাকে দেখলি?

হ্যাঁ।

কেমন?

খারাপ নয়।

খারাপ নয় কি রে? পাগল-করা মেয়ে। নইলে বিমান রায় অমন উঠেপড়ে লেগেছে!

আজ উঠি রে দিদি। রাত হয়েছে।

সাবধানে যাস। জোরে চালাস না।

নতুন মোটরবাইক এবং শীতরাতের ফাঁকা রাস্তা। জোরে না চালিয়ে কি পারে রতন? ভারী হেলমেটের ফাঁক ফোকর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস অবশ করে দিচ্ছে তার কান। কিন্তু গতিরও তো একটা আনন্দ আছে। আর কে জানে কেন জোরে মোটরবাইক চালালে তার মাথা পরিষ্কার হয়। হৈমন্তী তাকে অনেক কথা বলতে চেয়েছিল। কার্যত কিছুই বলতে পারেনি। তার সব কথা ডুবে যাচ্ছিল কান্নায়। শুধু বলতে পেরেছিল, আমার বড় ভয় করছে। আমার ভীষণ ভয় করছে। আর বলতে পেরেছিল, বলুন আমাদের কি কেউ নেই?

না, জবাবে রতন বলতে পারেনি, আমি আছি। বলার জোর ছিল না তার। বিমান রায় সত্যিই ইমপোর্টেন্ট না রটনা তা তো জানত না সে। এখন শুধু জানে, বিমান রায় মিথ্যেবাদী। কিন্তু এ সমাজে মিথ্যেবাদী কে নয়?

অনেক দ্বিধা রতনের। অনেক ভয়। এত ঠাণ্ডা বাতাস খেয়েও মাথাটা গরম লাগছে তার।

যখন সাতগাছি ফিরল তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। বাবার ঘরে আলো জ্বলছিল। উঁকি দিয়ে দেখল, বাবা চুপ করে বসে চিঠি পড়ছে। রোজ পড়ে।

বাবা!

খুব ধীরে মুখ ফেরাল অভিরাম। এবং আশ্চর্যের বিষয় আজ একটা অদ্ভুত কথা বলল, কোথায় গিয়েছিলি?

একথা কোনও দিনই জিজ্ঞেস করে না বাবা। কৌতূহল নেই।

রতন স্নিগ্ধ গলায় বলল, সদরে। দিদির কাছে।

অভিরাম আবার চোখ ফিরিয়ে নিজের নীরবতার জগতের চৌকাঠ পেরিয়ে গেল।

গভীর রাতে জেগে শুয়ে ছিল রতন। ঘর অন্ধকার। মশারির বাইরে একটা দুটো মশার গুঞ্জন। জেগে থাকতে আজ কেন ভাল লাগছে তার? কেন লাগছে?

নারী ও পুরুষের কাহিনী বড়ই পুরোনো। পৃথিবীর সেই প্রথম নারী ও পুরুষ থেকে শুরু হয়েছিল তাদের কাহিনী। বার বার বলা হচ্ছে। বলাই হয়ে যাচ্ছে কেবল। আজও নারী ও পুরুষ কেবল কাছে আসে, সরে যায়, কাছে আসে, সরে যায়, কাছে আসে...

নয়

আগে ব্রহ্মদাদু এলে ভারী আনন্দ হত তাদের। হাসিখুশি মানুষ, সরল সোজা, মজার মজার কথা বলত খুব, গল্পবাজ। তখন বাস থেকে নেমে অনেকটা পথ হেঁটে আসত। জুতোভর্তি ধুলো, মুখে ঘাম, হাসি। আজকাল ব্রহ্মদাদু আসছে গাড়িতে চেপে। পায়ে চকচকে জুতো, গায়ে কাশ্মীরি পুলওভার, গলায় শাল জড়ানো। কথাবার্তা গেরামভারী। আজকাল ব্রহ্মদাদু এলে হৈমন্তী পালায়, কখনও ছাদে, কখনও পাশের বাড়িতে, কখনও পিছনের বাগানে।

আজ সকালে এসে সতীশ ব্রহ্ম একটু তম্বির গলাতেই বলল, কী রে মহিন্দির, এখনও বাড়ির কাজে হাতই দিসনি দেখছি। এ বাড়িতেই কি বিয়ে হবে নাকি? ছাদের কার্নিশ ভাঙা, দেওয়ালের চাপড়া খসছে, ভিটেতে শ্যাওলা। বলি ভেবেছিসটা কী তুই? অমন হাত গুটিয়ে বসে

থাকলেই হবে?

মহেন্দ্র ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, সবই তো ঠিক ছিল কাকা। মিস্তিরিকে খবরও দেওয়া আছে। কিন্তু মিস্তিরি শালাদের তো জানেন, কথারই ঠিক নেই মোটে। পরশু থেকে কাজে লাগার কথা ছিল, আজ অবধি একটা উঁকিও মেরে যায়নি। তিনশো টাকা আগাম হজম করে বসে আছে।

তা সেটা আমাকে জানাবি তো! দরকার হলে সদর থেকে মিস্তিরি পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যেত। এ বাড়িতে যে বিয়ে করতে আসছে, তারও তো একটা মানমর্যাদা আছে রে! সোজা লোক তো নয় রে বাপু। তোদের যেন গা নেই মনে হচ্ছে। এ তো ভাল লক্ষণ নয়।

না না কাকা, আমি আজই গিয়ে মিস্তিরি ব্যাটাকে ধরছি। ওই নরেন পালের বাড়িতে কাজে লেগেছে কয়েকদিন।

দেখিস বাপু, কাজ যেন সময়মতো উদ্ধার হয়। না পারলে আমাকে বলিস।

সে আর বেশি কথা কি? ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। তা এই সোয়েটারখানা নতুন কিনলেন বুঝি? জম্পেস জিনিস।

সতীশ ব্রহ্ম ভারী লাজুক হেসে বলল, ওই হয়ে গেল একটা। অনেক দিন ধরে শখ ছিল। তাই বুড়ো বয়সে একখানা লাগিয়ে দিলুম। কবে মরেটরে যাই।

কথাটা জব্বর বলেছেন। সাধ আহ্লাদ সব এই বেলা মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

বাইরের ঘরের চৌকির ওপর বাবু হয়ে বসে সতীশ ব্রহ্ম বলল, সিঙ্গাপুরে হানিমুন হবে, বুঝলি?

আজ্ঞে?

বলি সিঙ্গাপুরের নাম শুনেছিস? পেল্লায় জায়গা। সেই জাপানের কাছে। কাল রাতেই ঠিক হল। বিয়ের পর দ্বিরাগমন সেরেই উড়োজাহাজে চেপে বসবে।

উরেব্বাস!

তাই তো বলছি, তোর মেয়ের কপাল খুলে গেল।

ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে উদাস চোখে চেয়ে আছে হৈমন্তী। কিছু নেই। সব ধু-ধু শূন্য। ফটকের সামনেই ঝকঝকে গাড়িটা দাঁড় করানো। রাজ্যের বাচ্চা জুটে হাঁ করে দেখছে গাড়িটা। দেখার মতোই গাড়ি।

হৈমন্তীর আজকাল কেবলই মনে হয় একটা ফাঁসির দড়ি তার জন্যই তৈরি রয়েছে। দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে চলল। কোনও দৈব ঘটনা ঘটল না তো। সে কথা দিয়েছিল, কিছু একটা করবে। করল না। পালিয়ে গেল। পৃথিবীতে কাউকেই আর বিশ্বাস করে না সে।

সে কি সুলক্ষণা! বেলঠাকুর বলেছিল বটে কথাটা। কচু। এই বুঝি সুলক্ষণার কপাল!

পরশুদিন মা গিয়েছিল রত্নাদির কাছে। রত্নাদি বলেছে, তার ভাই অনেকদিন আসেনি। ব্যবসাপত্র নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সেরকমই তো হওয়ার কথা। হৈমন্তীর কথা তার মনে থাকবে কেন? সে তো দেশোদ্ধার করে বেড়ায়। হৈমন্তী তার কে?

কিন্তু বড় আশা করে ছিল হৈমন্তী। কেন আশা করেছিল কে জানে। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল, এই তো এক জোরের পুরুষ। দীপ্ত, বহ্নিশিখার মতো। এ সব পারে। হৈমন্তী ভুল দেখতে পারে। কিন্তু তার মা? তার মারও ঠিক ওইরকমই মনে হয়েছিল যে!

হৈমন্তী শূন্য দিগন্তের দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে শুধু বলল, তুমি আসবে না। তুমি আর আসবে না।

ব্রহ্মদাদু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গটমট করে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

চলি রে মহিন্দের।

আসুন কাকা।

গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর হৈমন্তী ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল।

তৈরি হয়ে স্কুলে যাবে বলে বেরোতে যাচ্ছিল হৈমন্তী— কাঁধে বইয়ের ব্যাগ। ফটকের কাছে আসতেই দেখল চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে হাঁ করে দেখছে। বয়স্ক মানুষ। লম্বা, ফর্সা, সম্ভ্রান্ত চেহারা।

সবচেয়ে প্রবীণ যিনি, তিনি বললেন, এটা কি মহেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ি?

হ্যাঁ। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

সে অনেকটাই দূর থেকে। সাতগাছি। তুমিই বুঝি হৈমন্তী?

হৈমন্তী অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ।

চারজনই একসঙ্গে বলে উঠল, বাঃ!

হৈমন্তী লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল।

স্কুলে যাচ্ছিলে বুঝি?

হ্যাঁ। বাবা বাড়িতেই আছেন। আপনারা ভিতরে আসুন।

বুকটা একটু একটু কাঁপছে হৈমন্তীর। এরা কারা তা সে বুঝতে পারছে না। সাতগাছি কোথায় তাও সে জানে না। কী করেই বা এরা তার নাম জানল? কিচ্ছু বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ডিঙি নৌকো প্রবল স্রোতে দোল খাচ্ছে। দোল খাচ্ছে।

ভিতরে যাব বইকি মা। বড় গরজ নিয়েই এসিছি যে!

বলে প্রবীণ মানুষটি একটু তৃপ্তির হাসি হাসল।

হৈমন্তী তাদের ঘরে এনে বসিয়ে ছুটে গেল ভিতরে। মহেন্দ্র বাগানে গোলাপের কলম করছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে হৈমন্তী বলল, বাবা, শিগগির এসো! কারা যেন এসেছেন।

মহেন্দ্র অবাক হয়ে বলল, কারা রে? তুই অমন হাঁফাচ্ছিস কেন?

তুমি শিগগির এসো।

হাত ধুয়ে মহেন্দ্র বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

হৈমন্তী কিছু বুঝতে পারছে না। আবার পারছেও। আকাশের রং ওই বদলে যাচ্ছে। নীল থেকে গভীর নীল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে না চন্দনের গন্ধ! কী যে হচ্ছে চারদিকে! একটা নিঃশব্দ হুলুস্থুলু কাণ্ড যেন। এসব সে টের পাচ্ছে। বোবা এক আনন্দ, এক আশ্চর্য শিহরন বয়ে যাচ্ছে শরীরে। সে আর দাঁড়াল না। সে জানতে চায় না কিছু। এখনই জানতে চায় না। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে তার চারদিকে। ভেঙে যাচ্ছে পুরোনো সব কিছু। নতুন হয়ে ফের গজিয়ে উঠছে।

ছুট পায়ে সে স্কুলে চলে গেল।

শেফালি বলল, এই মুখপুড়ি, তোর মুখটা অমন লাল হয়ে আছে কেন রে?

লাল! তাই বুঝি! মুখ নিচু করে অকারণে লজ্জার হাসি হাসতে লাগল সে!

স্কুলে যে আজ কী সব হচ্ছিল। অঙ্ক দিদিমণির রোগা কালো মুখখানা অবধি যে কী সুন্দর দেখল আজ হৈমন্তী। ইংরিজির দিদিমণির কর্কশ গলা যেন ক্লাসে আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে গেল। টিফিনে একটুও খিদে পেল না তার, তবু অনেকটা আলুকাবলি খেয়ে ফেলল ভজুয়ার কাছ থেকে।

মালতী কনুইয়ে গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ বড্ড খুশি দেখছি যে তোকে! বিয়ের আনন্দ, না?

লজ্জায় মরে গিয়ে হৈমন্তী মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ-ই তো। হ্যাঁ।

ছুটির পর সে বাড়ি ফিরল আশ্চর্য দু'টি ডানায় ভেসে ভেসে।

বাড়ি ফিরতেই মা আথালি পাথালি হয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে।

জানিস মুখপুড়ি, কারা এসেছিল?

এই মাকে সে কখনও দেখেনি। এরকম জড়িয়ে ধরা, এত আবেগ কোথায় যে ছিল এতদিন! আবেগে কথাই আসছে না মুখে, কেবল বলছে, জানিস? জানিস? বিশ্বাস করবি না।

কিন্তু হৈমন্তী যে জানে! সব জানে। কারা এসেছিল। কেন এসেছিল। চোখ বুজে চুপটি করে মায়ের বুকের ধক ধক কান পেতে শুনছিল সে।

হাপুস কাঁদতে কাঁদতে লবঙ্গ বলল, তাকে দেখেই তো মনে হয়েছিল দেবদূত। সে কি সোজা ছেলে!

দু' হাতে আঁজলা করে হৈমন্তীর মুখখানা তুলে ধরে লবঙ্গ চেয়ে

রইল তার দিকে। বলল, এত ভাগ্য করেছিলি তুই! এত ভাগ্য?

চোখ বুজে আজ মায়ের এই আদরে স্নান করছিল সে।

স্নিগ্ধ স্বরে লবঙ্গ বলল, পঁচিশে মাঘ কবে জানিস? পরশু।

জানে। সব জানে হৈমন্তী। পরশু তার বিয়ে। কেউ বলেনি তাকে। কিন্তু সে সব জানে। কী করে যে জানে!

দুটো দিন সাবধানে থেকো মা। বঁটি ধোরো না, আগুনের কাছে যেও না। ঘরের বার হওয়ারও দরকার নেই। তারা খুব পাঁজিপুঁথি মানে। রক্ষণশীল পরিবার। বড় ভাল লোক তারা।

জানে। সব জানে হৈমন্তী। চারদিকের বাতাস ফিস ফিস করে সব বলে যাচ্ছে তাকে। বলে যাচ্ছে চাঁদের আলো, গাছের ছায়া, ফুলের গন্ধ। কিছু না জেনেও হৈমন্তী সব আগে ভাগে জেনে যাচ্ছে। সে মিষ্টি একটু হেসে বলল, আচ্ছা মা।

For More Books
Visit
www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com